কাকাবাবু সমগ্র

কাকাবাবু ও সিন্দুক-রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

১. কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন 2
২. ট্রেনটা বাদামপাহাড় স্টেশনে পৌঁছোল 15
৩. সকালবেলা প্রথম ঘুম ভাঙল সন্তুর 46
৪. মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা 62
৫. সন্তু আর জোজো কমলিকার সঙ্গে 79
৬. কাকাবাবু অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় 86
৭. গর্তে পড়ে যাওয়ার পর 95
৮. কাকাবাবু বসে আছেন রাজবাড়ির সামনে 104
৯. কিরণচন্দ্র ভঞ্জদের জ্বর 130

১. কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, জোজো একাই সব গল্প বলবে? আমরা বুঝি গল্প জানি না?

জোজো বলল, আমি তো গল্প বলি না! সব সত্যি ঘটনা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই যে বললি, একটা গোরিলা নারকোল গাছে উঠে নারকোল ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোর দিকে ছুড়ে মেরেছিল, সেটা গল্প নয়? আমরা শুনেছি, গল্পের গোরু গাছে ওঠে, আর তুই একটা গোরিলাকে গাছে তুলে দিলি? তাও অস্ট্রেলিয়ায়? আমরা তো ভাই ভূগোল বইয়ে পড়েছি, শুধু আফ্রিকাতেই গোরিলারা থাকে।

জোজো বলল, ভূগোল বইয়ে সব কিছু ঠিক ঠিক লেখা থাকে? আমেরিকায় কি সিংহ পাওয়া যায়?

সন্তু বলল, না।

জোজো বলল, আমেরিকায় একটা স্টেটে, খোলা জায়গায়, খাঁচায় না, চিড়িয়াখানাতেও না, খোলা জায়গায় সিংহ ঘুরে বেড়ায়। কত লোক দেখেছে, এটা কি গল্প? কাকাবাবু, আপনি তো আমেরিকায় গেছেন কয়েকবার, আপনি দেখেননি?

কাকাবাবু বললেন, দেখিনি। তবে শুনেছি। সাফারি পার্কে সিংহ ছাড়া থাকে ঠিকই। নিউ জার্সিতে এরকম একটা সাফারি পার্ক আছে। এক দেশের জন্তু-জানোয়ার অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয় তো বটেই, নইলে আর চিড়িয়াখানাগুলো চলছে কী করে?

সন্তু তবু বলল, জোজো অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের মধ্যে গোরিলা দেখেছে!

জোজো বলল, হ্যাঁ, দেখেছি তো!ইট আ ফ্যাক্ট! আর-একবার, ভুটানের রাজা আমার বাবাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন, সেখানে এক রাত্তিরবেলা...

তাকে থামিয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, আমরাও এমন সব সত্যি ঘটনা জানি, যা একেবারে গল্পের মতন। আমি যদি বলি, একবার এক বাঘ, ছোটখাটো না, মস্ত বড় বাঘ আমার বুকের উপর দুটো থাবা তুলে দাঁড়িয়েছিল, তুমি বিশ্বাস করবে?

জোজো খানিকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, সার্কাসের বাঘ নিশ্চয়ই। ওগুলোকে আফিম খাইয়ে রাখে, তাই কামড়ায় না।

কাকাবাবু বললেন, না, সার্কাসের বাঘ নয়।

জোজো বলল, তা হলে কারও পোষা বাঘ!

সন্তু বলল, বাঘ আবার পোষ মানে নাকি?

জোজো বলল, পোষ মানাতে জানলেই পোষ মানে! আমার পিসেমশাইয়েরই তো তিনটে পোষা বাঘ আছে, তার মধ্যে একটার গায়ের রং সাদা। আমার পিসেমশাই কে জানিস? রেওয়ার রাজা। রেওয়া কোথায় তা জানিস না বোধহয়। মধ্যপ্রদেশে। সেখানকার জঙ্গলেই প্রথম সাদা বাঘ পাওয়া গিয়েছিল!

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, নাঃ, জোজোর সঙ্গে পারা যাবে না! এর আগে তোমার সাতজন পিসেমশাইয়ের কথা শুনেছি।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, তুমি তোমার বাঘের গল্পটা বলো!

এই সময় ট্রেনের গতি কমে এল।

অন্যদিক থেকে একজন খুব রোগা চেহারার যাত্রী জিজ্ঞেস করল, এটা কোন স্টেশন?

কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করে বললেন, কিছুই তো ভাল করে দেখা যায় না। সন্ধে হয়ে গেছে।

রোগা যাত্রীটি বিরক্তভাবে বলে উঠল, আজকাল এই হয়েছে এক ঝমেলা। ট্রেনের জানলা খোলা যায় না, কাচগুলোও ঝাপসা আর ময়লা, বাইরেটা দেখার উপায় নেই। আগে আমরা কী সুন্দর খোলা জানলায় মাথা রেখে বাইরের গাছপালা, পাহাড়, নদী দেখতে দেখতে যেতাম।

রেলের কামরায় যাত্রীদের মধ্যে সবসময় দুরকম মতের লোক থাকে। কেউ কোনও বিষয়ে কিছু বললে অন্য একজন প্রতিবাদ করবেই।

অন্যদিক থেকে কুস্তিগিরের মতন চেহারার একজন যাত্রী বলে উঠল, কে বলল, ট্রেনের জানলা খোলা যায় না? এ সি কামরার বদলে সাধারণ সেকেন্ড ক্লাসে গেলেই হয়। সেখানে ইচ্ছেমতন জানলা খোলা যায়!

রোগা যাত্রীটি বলল, না মশাই, আজকাল ইচ্ছেমতন অনেক কিছুই করা। যায় না! সেকেন্ড ক্লাসেও জানলা খুলতে গেলেই পাশের লোকটি বলবে, জানলা খুলবেন না, খুলবেন না! রোদ আসবে, হাওয়া আসবে, বৃষ্টি আসবে, ধুলোবালি আসবে! আজকাল লোকের স্বাস্থ্যবাতিক এত বেড়েছে।

কামরার মাঝামাঝি জায়গায় বসে আছেন একজন সাধুবাবা। গেরুয়া কাপড় পরা আর মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। তিনি সর্বক্ষণ চোখ বুজে রয়েছেন, এখনও চোখ বোজা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলেন, স্টেশনের নাম কে জানতে চাইলেন?

রোগা লোকটি বলল, আমি। দেখি দরজার কাছে গিয়ে।

সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নামতে চান কোথায়?

রোগা লোকটি বলল, বারিপদা।

সাধুবাবা বললেন, আপনি তৈরি হয়ে নিন, সামনেই বারিপদা আসছে।

সন্তু ফিসফিস করে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, সাধুবাবা কি চোখ বুজে ধ্যানে সব দেখতে পেলেন?

কাকাবাবু বললেন, তা হতেও পারে। কিংবা উনি হয়তো এই রুটে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাতে সব স্টেশনের নাম আর সময়টা মুখস্থ হয়ে যায়। ট্রেনের হকাররাও এরকম না দেখেই বলে দিতে পারে।

জোজো বলল, আমরা কোথায় নামব?

কাকাবাবু বললেন, আমাদের বাদামপাহাড় পর্যন্ত টিকিট। এখানেও নামা যায়। থাক, এ জায়গাটায় খুব ভিড়। বাদামপাহাড় বেশ নিরিবিলি। ওখানে

আমাদের নিতে আসবে একজন।

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা শেষ পর্যন্ত যেখানে যাচ্ছি, সেই জায়গাটার নাম ঘিসিং?

কাকাবাবু বললেন, ঘিসিং নয়, খিচিং। জোজো বুঝতে না পেরে বলল, কিচিং?

সন্তু বলল, শুনতে পেলি না? খিচিং! খিচিং!

জোজো বলল, এরকম অদ্ভুত জায়গার নাম আগে কখনও শুনিনি!

কাকাবাবু বললেন, এ দেশের কত জায়গার বিচিত্র সব নাম আছে। আমরা আর কতটুকু দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কত দেশ ঘুরেছেন, তবু তিনি লিখেছেন, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি। দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী...। এই খিচিংও কিন্তু একসময় রাজধানী ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের।

চোখ বুজে থাকা সন্ন্যাসীটি বললেন, মহাশয়েরা খিচিং যাবেন? বেশ, বেশ, আমারও গন্তব্য সেখানেই।

এবারেও তিনি কথা বলার সময় চোখ খুললেন না। যদিও কথাটা বললেন বাংলায়, তবু উচ্চারণে একটু টান শুনে মনে হয়, বাঙালি নন। এই ট্রেন যাবে সম্বলপুর পর্যন্ত, কামরার মধ্যে ওড়িশার মানুষই বেশি।

জোজো সাধুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আপনি বুঝি চোখ বুজে দেখতে পান?

সাধু বললেন, অনেক কিছুই দেখতে পাই। কেন পাই জানো? আমি মাসের মধ্যে পনেরো দিন সবসময় চোখ বুজে থাকি। আর বাকি পনেরো দিন চোখ ভোলা রাখি।

জোজো বলল, পনেরো দিন সবসময় চোখ বুজে থাকেন? একবারও খোলেন না?

সাধু বললেন, না। সেই পনেরোদিন একেবারে অন্ধের মতন থাকি।

জোজো বলল, কেন?

সাধু বললেন, তাতে মনের মধ্যে বেশ একখানা আয়না তৈরি হয়। যত দিন যাচ্ছে, ততই সেই আয়নাটা পরিষ্কার হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, এ-কথাটা বেশ সুন্দর।

সাধু এবার কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পায়ে বুঝি অসুখ আছে? কোনও কিছুর সাহায্য নিয়ে হাঁটতে হয়?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমি খোঁড়া মানুষ। ক্রাচ নিয়ে হাঁটি। আপনি চোখ বুজে সেটাও দেখতে পেয়েছেন?

সাধু একটু হেসে বললেন, সবকিছু তো দেখার দরকার হয় না। আপনি একটু আগে বাথরুমে গেলেন, তখন খটখট শব্দ হচ্ছিল।

কাকাবাবু বললেন, খটখট শব্দ শুনে বোঝা যেতে পারে যে, আমি ক্রাচ নিয়ে হাঁটছি। কিন্তু আমি যে বাথরুমেই গিয়েছিলাম, তা আপনি বুঝলেন কী করে?

সাধু বললেন, চলন্ত ট্রেনে বয়স্ক লোকেরা নিজের জায়গা ছেড়ে আর কোথায় যান? বাচ্চারা দৌড়োদৌড়ি করে অবশ্য।

সন্তু চাপা গলায় বলল, শার্লক হোম!

সাধুটি সেটাও শুনতে পেয়ে বললেন, আমি শার্লক হোমসের অনেক গল্প পড়েছি একসময়। একটা গল্পের নাম দ্য হাউন্ড অফ বাস্কারভিল, তাই না?

ইংরেজি উচ্চারণ শুনেই বোঝা গেল, ইনি বেশ ভালই লেখাপড়া জানেন।

সন্তু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি যদি কিছু মনে না করেন।

সাধু বললেন, তোমার মনে যা এসেছে, বলে ফেলো!

সন্তু বলল, আপনি সাধু হয়েছেন কেন? সাধু একটু সময় নিয়ে বললেন, আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন পরে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দেব।

সন্তু বলল, পাঁচদিন পর? আপনার সঙ্গে তখন দেখা হবে কোথায়? আমরা তো খিচিং-এ মাত্র তিনদিন থাকব।

সাধু বললেন, হবে, হবে, ঠিকই দেখা হবে।

ট্রেন এসে থামল বারিপদা স্টেশনে। কিছু লোক নামল এখানে। কিছু যাত্রী উঠে এল হুড়মুড়িয়ে। নানারকম হকার শুরু করে দিল চেঁচামেচি। এর মধ্যে কথা বলা যায় না।

কাকাবাবু বড় এক ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ফেললেন। সন্তু আর জোজো তা থেকে বাদাম তুলে নিতে লাগল, খোসাগুলো মেঝেতে না ফেলে জড়ো করতে লাগল একটা খবরের কাগজ পেতে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে একটা চোখের ইঙ্গিত করলেন।

অর্থাৎ তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, সাধুবাবা বাদাম খাবেন কিনা।

সন্তু বলল, স্যার, আপনি কি চিনেবাদাম খাবেন?

কাকাবাবু বললেন, ও কী, স্যার আবার কী? সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে নেই।

জোজো বলল, বলতে হয় মহারাজ, তাই না? কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করার আগেই সাধুটি বললেন, আমি বাদাম খেতে ভালইবাসি। কিন্তু আজ আমার উপবাস। তোমাদের কল্যাণ হোক।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি নিরম্বু উপবাস?

সাধু মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

জোজো জিজ্ঞেস করল, নিরম্বু মানে কী?

কাকাবাবু বললেন, অম্বু মানে জল। নিঃ অম্বু, তার মানে জল খাওয়াও চলবে না।

জোজো বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে অনেক সাধু আসেন, হিমালয় পাহাড় থেকে। একজনের নাম গাঠিয়াবাবা, তিনি টানা সাতদিন না খেয়ে থাকেন। একফোটা জলও খান না। একবার হয়েছে কী, তিনি ভগবানের গান গাইতে গাইতে কাঁদছেন, কয়েক ফোটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে এসে তার মুখে ঢুকে গেছে! তাতেই

তো জল খাওয়া হয়ে গেল! সেইজন্য তিনি তখন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। আর-একজন সাধু...

তাকে বাধা দিয়ে সন্তু বলল, তুই একটু চুপ কর তো! কাকাবাবু, তুমি যে বাঘের গল্পটা বলছিলে–

কাকাবাবু বললেন, সেটা পরে বলব।

সন্তু বলল, পরে না, এখনই বলো।

কাকাবাবু বললেন, গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। তোরা খৈরি বলে কোনও বাঘের নাম শুনেছিস?

জোজো আর সন্তু দুদিকে মাথা নেড়ে বোঝাল যে, নাম শোনেনি।

কাকাবাবু বললেন, তোরা জানবি কী করে। অনেক বছর আগের কথা। এখানে যোশিপুর নামে জায়গায় একটা ফরেস্ট বাংলো আছে। সেখানে খৈরি নামে একটা পোষা বাঘ ছিল।

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, দেখলি, দেখলি, বাঘ পোষ মানে কি না!

কাকাবাবু বললেন, এ-বাঘটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষ মানেনি। খৈরি নামে একটা ছোট্ট নদী আছে, তার কাছে এক ফরেস্ট অফিসার একটা বাচ্চা বাঘ পেয়েছিলেন, তার মা কাছাকাছি ছিল না। তিনি বাচ্চাটাকে কুড়িয়ে এনে বাংলোতে রাখলেন। তার নাম দিলেন খৈরি। দিন দিন সেটা বড় হতে লাগল। দিকে দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল, কারণ একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পোষ মানাবার চেষ্টা হচ্ছে, এটাই তো আশ্চর্য ঘটনা।

জোজো জিজ্ঞেস করল, বাঘটা কত বড়?

কাকাবাবু বললেন, ছোট্ট অবস্থায় কুড়িয়ে আনা হয়েছিল, কিন্তু আমি যখন দেখি, ততদিনে সেটা মস্ত বড় হয়ে গেছে। সাধারণ বাঘের চেয়েও বড়। কেন জানিস? বনের বাঘকে তো

প্রচুর পরিশ্রম করে শিকার খুঁজতে হয়, হরিণের পেছনে দৌড়োতে হয় মাইলের পর মাইল। কিন্তু খৈরিকে সেসব কিছুই করতে হয় না, তাকে রোজ খেতে দেওয়া হয় দশ কিলো মাংস। সে দিব্যি বসে বসে খায়। আর মোটা হয়।

জোজো বলল, কীসের মাংস? মানুষের?

কাকাবাবু বললেন, যাঃ! মানুষের মাংস পাওয়া যাবে কোথায়? সব বাঘ মানুষের মাংস খায়ও না। ওকে দেওয়া হত মোষের মাংস। সেই খেয়ে খেয়ে বাঘটা বেশ মোটা আর থলথলে হয়ে গিয়েছিল। ওকে রাখা হয়েছিল বাংলোর কম্পাউন্ডের মধ্যে। সেখানে অনেকটা বাগান আছে, সবই তারকাটা দিয়ে ঘেরা। বাঘটা তার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, বাঁধা থাকে না?

কাকাবাবু বললেন, না, ওই বাংলোর মধ্যে যেখানে খুশি যেতে পারে, এমনকী ঘরের মধ্যেও ঢুকে পড়ে।

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি একা গিয়েছিলে?

কাকাবাবু বললেন, আমার সঙ্গে ছিল নরেন্দ্র ভার্মা। তার মানে, আমি যে সত্যি ঘটনা বলছি, তার সাক্ষী আছে। নরেন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি। আমরা দুজনে যাচ্ছিলাম সিমলিপাল ফরেস্টে, রাত্তিরটা ওই বাংলোয় থাকতে হবে। বাংলোটার ঠিক সামনেই একটা গোলমতন বসার জায়গা। ফরেস্ট অফিসারের নাম সরোজ চৌধুরী, আমরা তার সঙ্গে গল্প করছি, একটু দূরে একটা গাছতলায় বাঘটাকে খাওয়ানো হচ্ছে।

জোজো বলল, খাওয়ানো হচ্ছে মানে? খাইয়ে দিতে হয়?

কাকাবাবু বললেন, তাই তো দেখলাম। একজন ভদ্রমহিলা বড় বড় মাংসের টুকরো ওর মুখের কাছে ধরছেন, আর বলছেন, খাও, লক্ষ্মীসোনা, আর-এক গেরাস খেয়ে নাও! বাঘটা গরর-গরর শব্দ করছে, আর মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে দূরে। তখন ভদ্রমহিলা

ডাকছেন, খৈরি, দুষ্টুমি করে না, এদিকে এসো, এখনও অর্ধেকটাও খাওয়া হয়নি, চলে এসো। এরপর একটা চকোলেট দেব!

জোজো হেসে ফেলল।

কাকাবাবুও হেসে বললেন, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? কিন্তু এর প্রত্যেকটি অক্ষর সত্যি। ঠিক যেন দুরন্ত একটা বাচ্চা ছেলে, তাকে খাওয়ানো হচ্ছে ভুলিয়ে-ভালিয়ে। আসলে, বাঘেরা একসঙ্গে অনেকটা খায় না। শিকার করে খানিকটা খেয়ে চলে যায়। কয়েক ঘণ্টা পরে আবার ফিরে আসে, আবার খায়। একবার বাঘটা চলে এল আমাদের কাছে। কোনও বাড়ির পোষা কুকুর যেমন নতুন লোকজন দেখলে কাছে এসে গন্ধ শোকে, এই বাঘটাও সেরকম করতে লাগল। কিন্তু এটা তো কুকুর নয়, বাঘ। যতই পোষা হোক বা না হোক, অত কাছাকাছি একটা বাঘ দেখলে তো ভয় লাগবেই।

জোজো বলল, এক-একটা কুকুর দেখলেও আমার ভয় লাগে। একবার কাশ্মীরে একটা কুকুর প্রায় বাঘের মতনই বড়, হঠাৎ আমার পিছন দিক থেকে,

সন্তু বলল, এই জোজো, তুই চুপ কর। তোর গল্প পরে শুনব। এখন কাকাবাবুকে বলতে দে!

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, আমি গল্প বলি না। সব ফ্যাক্ট!

কাকাবাবু বললেন, আমরা হাত-পা গুটিয়ে সিঁটিয়ে বসে আছি দেখে সরোজবাবু বললেন, ভয় পাবেন না। ও কাউকে কামড়ায় না। কাছে এলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিন! কিন্তু আমার সে সাহস হল না! নরেন্দ্রকে তো জানিস, খুব সাহসী, আর ডাকাবুকো মানুষ, সে একবার ডান হাতটা তুলতেই বাঘটা তার কনুইটা মুখে ভরে ফেলল।

সন্তু বলল, অ্যাঁ কামড়ে দিল?

কাকাবাবু বললেন, কনুইটা মুখে ভরে দিল বাঘটা। কিন্তু দাঁত বসায়নি! যে-কোনও মুহূর্তে হাতটা কেটে নিতে পারে।

সন্তু বলল, নরেনকাকা কী করলেন তখন?

কাকাবাবু বললেন, আমি আগে অনেকবার শুনেছি যে, খুব ভয় পেলে নাকি মানুষের চুল খাড়া হয়ে যায়। সেই প্রথম দেখলাম স্বচক্ষে। নরেন্দ্রর সব চুল খাড়া হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বেরোচ্ছে না। বড় বড় চোখে

তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি চেঁচিয়ে সরোজবাবুকে বললাম, ও মশাই, বাঘটাকে সরিয়ে নিন, সরিয়ে নিন।

সরোজবাবু বললেন, জোর করে ওকে সরানো যায় না! নড়বেন না, একদম নড়রেন না। ও কিছু করবে না।

আমি তবু বললাম, আপনার কাছে ডেকে নিন! ও যদি আমার বন্ধুকে কামড়ায়!

আমি বোধহয় খুব জোরে চেঁচিয়েছিলাম, তাই বাঘটা নরেন্দ্রকে ছেড়ে দিয়ে চলে এল আমার কাছে। ফোস ফোস করে খানিকটা গন্ধ শুঁকে সরে গেল। তারপর অন্য যে চেয়ারগুলো ফাঁকা ছিল, সেগুলোরও গন্ধ শুকতে লাগল।

বাঘটা নরেন্দ্রকে পুরো কামড়ায়নি বটে, কিন্তু একটা সঁাত ফুটে গেছে, একটু একটু রক্তও বেরোচ্ছে। দু-এক মিনিটের মধ্যে একটু সামলে নিয়ে নরেন্দ্র বলল, রাজা, আমরা কিছুতেই এখানে রাত্রে থাকব না। চলো, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু বাঘটা তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে কাছাকাছি। ওর পাশ দিয়ে যাব কী করে? তবু, আমি কিছু না ভেবে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা

আমার কাছে চলে এসে মাথা দিয়ে আমার বগলে একটি ডুসো মারল।

এমনিতেই দারুণ গরম ছিল। তার উপরে ভয়ের চোটে দরদরিয়ে ঘাম বেরিয়ে আমার জামা একেবারে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

সরোজবাবু বললেন, ভয় পাবেন না। ও ঘামের গন্ধ ভালবাসে। খৈরি, তৈরি কাম হিয়ার!

আমি ভাবলাম, রোজ রোজ মোষের মাংস বোধহয় ওর একঘেয়ে লাগছে। তাই আজ একটু মানুষের মাংস খেতে চাইছে। এখনও মন ঠিক করতে পারছে না। ও আমার বগলের কাছে আর-একবার ঠুসো মারতেই আমি উঠে দাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দুপায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, দুটো থাবা রাখল আমার বুকের উপরে। আমার ঠিক মুখের সামনে ওর বিরাট হাঁড়ির মতন মুখ, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। জীবনে এত ভয়ই পাইনি কখনও, ধড়াস ধড়াস করে শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। যে-কোনও মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনার সব চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল?

কাকাবাবু বললেন, হয়তো উঠেছিল। নিজের চুল তো নিজে দেখা যায়!

জোজো আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন?

কাকাবাবু বললেন, আর দু-এক মুহূর্ত দেরি হলে নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতাম। বাঘটা সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। হঠাৎ মুখ দিয়ে ফ-র- র-র শব্দ করল, তাতেই বৃষ্টির মতন তার থুতু আর লালা এসে লাগল আমার মুখে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে যে-মহিলাটি বাঘটিকে মাংস খাওয়াচ্ছিলেন, তিনি এসে বাঘটার কাধে চাপড় মেরে বলতে লাগলেন, খৈরি, খৈরি, দুষ্টুমি করে না, এসো, খেয়ে নেবে এসো। তখন বাঘটা আমাকে ছেড়ে সুড়সুড় করে চলে গেল তার সঙ্গে?

একটু থেমে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে কাকাবাবু বললেন, বাবা, সেই ঘটনা মনে পড়লে এখনও আমার বুক কাঁপে। তা হলে বুঝলে তো, জোজোকুমার, আমাদের জীবনেও অনেক সত্যিকারের রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে। বাঘের থাবার ছাপকে বলে পাগ

মার্ক, আমার বুকের উপর পাগ মার্ক পড়েছিল। সে রাত্তিরে আর আমরা সেখানে থাকিনি।
সন্তু জিজ্ঞেস করল, শেষ পর্যন্ত বাঘটার কী হল?

কাকাবাবু বললেন, শেষ পর্যন্ত খৈরি পোষ মানেনি। ক্রমশ ওর শিকার করার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। বাংলোর একটা পোষা কুকুরকে মেরে ফেলল একদিন। ওখানে যারা গার্ড ছিল, তাদের কয়েকজনকে থাবা মেরে আহত করল। তখন ঠিক করা হল, ওকে জঙ্গলে ছেড়ে আসা হবে। পরের ব্যাপারটা বেশ দুঃখের। জঙ্গলে ছেড়ে আসা হল খৈরিকে। কিন্তু জঙ্গলের অন্য বাঘরা ওকে আপন করে নিতে চাইল না। মানুষের কাছাকাছি বেশিদিন থাকলে বাঘের গায়েও নাকি মানুষ মানুষ গন্ধ হয়ে যায়। তাই একদিন কয়েকটা বাঘ মিলে মেরে ফেলল খৈরিকে।

২. ট্রেনটা বাদামপাহাড় স্টেশনে পৌঁছোল

ট্রেনটা বাদামপাহাড় স্টেশনে পৌঁছোল ঠিক সন্ধের মুখে।

কাকাবাবুদের সঙ্গে সেই সাধুবাবাও নামলেন এখানে। এখনও চক্ষু বোজা। সেই অবস্থাতেও ট্রেন থেকে নামতে কোনও অসুবিধে হল না। দিব্যি হেঁটে চললেন গেটের দিকে।

বিনয়ভূষণ মহাপাত্র নামে একজন পুলিশ অফিসারের স্টেশনে অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু সেরকম কাউকে দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো এসে পৌঁছোতে পারেনি। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করে দেখা যাক।

প্ল্যাটফর্মে বেশি লোকজন নেই। একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সি মানুষ এঁদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাড়াল। কাকাবাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে সে বলল, আপনি রাজা রায়চৌধুরী, না?

কাকাবাবু মাথা নাড়লেন।

লোকটি বলল, আপনি এখানে এসেছেন, সাবধানে থাকবেন। আপনার বিপদ হতে পারে, সাবধানে থাকবেন।

তারপরই সে হনহনিয়ে এগিয়ে গেল।

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সন্তু, ওই লোকটাকে ধরে দাড় করা তো। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

সন্তু আর জোজো দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটির দুপাশে।

ক্রাচ বগলে নিয়ে ওদের কাছে এলেন কাকাবাবু। ধুতি পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? আপনি হঠাৎ আমাকে ভয় দেখালেন কেন?

লোকটি বলল, ভয় দেখাইনি তো! আপনাকে শুধু একটু সাবধান করতে চাইলাম। আমি একজন সাধারণ মানুষ।

কাকাবাবু বললেন, গায়ে পড়ে সাবধান করতেই বা গেলেন কেন?

লোকটি বলল, বাঃ, মানুষ মানুষকে সাহায্য করে না?

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক, আমার কী বিপদ হতে পারে, তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন?

লোকটি বলল, না, তা জানি না। তবে, আপনি তো বিখ্যাত লোক। আপনার যেমন অনেক ভক্ত আছে, তেমনই বেশ কিছু শত্রুও আছে। তাই আপনাকে এখানে দেখে মনে হল, যদি শত্রুরা আপনার আসবার কথা টের পায়... আমি চলি, আমাকে বাস ধরতে হবে।

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট ক্যামেরা বের করে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?

লোকটি একটু দ্বিধা করে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের কাকাবাবুর সঙ্গে আমার একটা ছবি তুলে দাও। ছবিটা আমি বাঁধিয়ে রাখব।

ক্যামেরা ফোকাস করতে করতে সন্তু বলল, কিন্তু ছবিটা আপনাকে দেব কী করে?

লোকটি বলল, সে আমি ঠিক জোগাড় করে নেব। আশাকরি তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।

ছবি তোলা হয়ে গেলে সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে আর-একটা কথা বলে যাই। আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছেন, তা সফল হবে না!

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, যে কাজের জন্য এসেছি মানে? আমি তো কোনও কাজে আসিনি। এমনিই বেড়াতে এসেছি।

লোকটি এবারে শুধু হাসল। তারপর হাত জোড় করে বলল, আচ্ছা চলি, নমস্কার!

সে গেটের দিকে চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, আশ্চর্য! একজন সাধুবাবা বলল, পাঁচদিন পর আবার দেখা হবে। এই লোকটিও বলল, আবার দেখা হবে! এখানে থাকব মোটে তিনদিন, তারপর চলে যাব সম্বলপুর।

জোজো বলল, আমার মনে হয়, এই লোকটি জ্যোতিষী।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই কী করে বুঝলি?

জোজো বলল, উনি সব কথা বলছিলেন কাকাবাবুর কপালের দিকে তাকিয়ে। কোনও কোনও জ্যোতিষী মানুষের কপাল দেখেই তার মনের কথা বলে দিতে পারে। আমার বাবা একবার দিল্লি এয়ারপোর্টে বসে ছিলেন, একসময় দেখতে পেলেন সদলবলে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধী। রাজীব গাঁধীর কপালের দিকে তাকিয়েই বাবা চমকে উঠলেন। অমনি চেঁচিয়ে ডাকলেন, রাজীব, রাজীব, এক মিনিট দাড়াও। ওইভাবে অবশ্য ডাকা উচিত হয়নি। অত লোকজনের মধ্যে, প্রধানমন্ত্রী তো। রাজীব সেই ডাক শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালেন, তারপর কাছে এসে বাবাকে প্রণাম করলেন পায়ে হাত দিয়ে। ছেলেবেলায় ওঁর মায়ের হাত ধরে তো অনেকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে। আমার

মায়ের হাতের রান্না চিড়ের পোলাও খেয়ে বলেছেন, আর- একটু দিন! বাবা ওঁকে সেদিন জিজ্ঞেস করলেন–

জোজোর গল্প শেষ হল না, পুলিশের পোশাক-পরা একজন লোক হাজির হলেন দৌড়োতে দৌড়োতে। তার সঙ্গে একজন সাধারণ প্যান্ট-শার্ট পরা। তাদের মধ্যে একজন বললেন, মাপ করবেন স্যার, আমাদের পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল। আসলে এই ট্রেনটা কোনওদিন ঠিক সময়ে আসে না। অন্তত দেড়-দুঘণ্টা লেট হয়, আজই এসে পড়েছে ঠিক সময়। আমাদের আবার দেরি হল, রাস্তায় হাতি এসে পড়ে অনেকটা সময় নষ্ট করে দিল।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম বিনয়ভূষণ মহাপাত্র, আর এর নাম গুরুপদ রায়।

কাকাবাবু বললেন, এই যে আমার ভাইপো সন্তু আর ওর বন্ধু জোজো। চলুন এবার যাওয়া যাক!

বিনয়ভূষণ বললেন, আগে একটু চা-টা খেয়ে বিশ্রাম নেবেন, না এক্ষুনি রওনা হবেন?

কাকাবাবু বললেন, ট্রেনে এসেছি, পরিশ্রম তো হয়নি কিছু। বিশ্রাম নেওয়ার দরকার নেই। খিচিং পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগবে?

বিনয়ভূষণ বললেন, জিপ এনেছি। ঘণ্টাদুয়েকের রাস্তা, তবে আবার যদি হাতি এসে পড়ে, তা হলেই মুশকিল।

সন্তু বলল, হাতি এসে পড়লে তো ভালই। বেশ হাতি দেখা যাবে! ছবি তুলতে পারব?

বিনয়ভূষণ বললেন, হাতির পাল এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতে পারে। খুব কাছে তো যাওয়া যাবে না। মেজাজ খারাপ থাকলে জিপগাড়ি উলটে দেয়।

জোজো বলল, হাতি তো এমনিতে খুব শান্ত প্রাণী। তাদের মেজাজ খারাপ হয় কেন?

কাকাবাবু বললেন, জঙ্গল থেকে হাতিরা যখন বেরিয়ে আসে, মাঝে মাঝে তারা খিদের চোটে কোনও ফসলের খেতে ঢুকে পড়ে। তাতে প্রচুর ফসলের ক্ষতি হয়। হাতিরা যত খায়, তার চেয়ে নষ্ট করে বেশি। সেইজন্য ফসল যারা চাষ করে, সেই চাষিরা খেপে যায়। হাতি তাড়াবার জন্য তারা বড় বড় জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারে। সেই মশালের আগুনে আহত হলে হাতিরাও খেপে ওঠে। তখন সামনে যা পায়, তাই ধ্বংস করে।

জোজো বলল, ইস, হাতিদের গায়ে মশাল ছুড়ে মারে? ভেরি ব্যাড। ওদের খিদে পেলে তো ওরা ফসল খাবেই!

সন্তু বলল, বা রে, চাষিরা কি হাতিদের খাওয়াবার জন্য ফসল ফলায়? ওই ফসল বিক্রি করে তাদের সারা বছর চলে। ফসল নষ্ট হয়ে গেলে তারাই বা খাবে কী?

জোজো বলল, একেই বলে হর্নস অফ আ ডায়লেমা। আচ্ছা কাকাবাবু, যদি আপনাকে বিচার করতে বলা হয়, হাতিরা যদি খিদের সময় ফসল খেয়ে ফেলে, তারা তো জানে না কার খেত কিংবা কারা চাষ করেছে, খিদে পেয়েছে তাই খেয়েছে। আর ওদিকে চাষিরা তাদের ফসল নষ্ট হচ্ছে দেখে রাগের চোটে জ্বলন্ত মশাল ছুড়ে মারে। তা হলে কারা বেশি দোষী? হাতিরা, না চাষিরা?

কাকাবাবু বললেন, আসল অপরাধী হচ্ছে, যারা বেআইনিভাবে জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে গাছ বিক্রি করার লোভে। জঙ্গল কমে যাচ্ছে, জঙ্গলে খাবার কমে যাচ্ছে বলেই তো হাতিরা বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেই অপরাধীদের ধরা যায় না।

বিনয়ভূষণ বললেন, ঠিক বলেছেন স্যার! আগেকার তুলনায় এদিকে কত জঙ্গল কমে গেছে। জঙ্গল-কাটা ফাঁকা জমিতে শুরু হচ্ছে চাষ। হাতিরা তা বুঝবে কী করে? তাই তারা ফসলের খেতে ঢুকে পড়ে।

এর মধ্যে সবাই মিলে উঠে পড়েছে একটা জিপগাড়িতে।

থানার ড্রাইভার অসুস্থ বলে আসেনি, গাড়ি চালাচ্ছে গুরুপদ রায়। তার মুখোনা অস্বাভাবিক রকমের কালো, মনে হয় যেন কখনও আগুনের ঝাপটা লেগেছিল। সে এ পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি।

বিনয়ভূষণের ফরসা গোলগাল মুখ, মাথার অর্ধেকটা টাক। মাঝে মাঝে প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন আর খালি হাতটাই বের করে আনছেন।

কাকাবাবু বসেছেন সামনে। ড্রাইভারের পাশের সিটে। পিছনে বাকি তিনজন। রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো, অনবরত লাফাচ্ছে জিপ।

তবে আকাশটা এখন দেখার মতন। দিনের শেষে বিদায় নিচ্ছেন দিনমণি। পশ্চিমের আকাশ ঠিক লাল নয়, সোনার মতন ঝকঝকে। কিছু কিছু মেঘের খানিকটা লাল, খানিকটা কালো হয়ে এসেছে। এক-এক ঝাক পাখি উড়ে যাচ্ছে সেই লাল রং পেরিয়ে কালোর দিকে।

দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাহাড়। এক-এক জায়গায় পাহাড়ের চূড়া মিশে গেছে মেঘের সঙ্গে।

বিনয়ভূষণ আর-একবার পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললেন, রায়চৌধুরীবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু যদি মনে করেন। আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি? আপনি সিনিয়র অফিসার, আপনার অনুমতি না নিয়ে তো খাওয়া যায় না!

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, খান। আমি এখন আর অফিসার নই, আসলে আমি সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারি না। একটার বেশি খাবেন না।

বিনয়ভূষণ বিগলিতভাবে বললেন, না, না, স্যার, একটার বেশি নয়। জানলার বাইরে ধোঁয়া ছাড়ছি।

সন্তু অন্যদিকের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দুদিকের গাছপালা অন্ধকারে ঝুপসি হয়ে এসেছে। হঠাৎ মনে হয় যেন চুপ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে একপাল হাতি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, এখানে বাঘ আছে?

বিনয়ভূষণ বললেন, ঠিক এখানে নেই, তবে সিমলিপাল জঙ্গলে অনেক। বাঘ আছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ছিটকে এদিকেও চলে আসে। গত মাসেও একজোড়া এসেছিল, কয়েকটা গোরু মেরেছে।

সন্তু বলল, সিমলিপাল জঙ্গলে এখান থেকে যাওয়া যায় না?

বিনয়ভূষণ বললেন, হ্যাঁ, যাবে না কেন? আমি নিয়ে যেতে পারি। জঙ্গলের মধ্যে ভারী সুন্দর সুন্দর সব জায়গা আছে। চাহালা, নওয়ালা, বহেরি পানি, জেরান্ডা, গুরগুরিয়া, জেনাবিল, যেখানে যেতে চাও।

সন্তু বলল, গুরগুরিয়া নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ওখানেই যাব।

কাকাবাবু বললেন, আপনাদের এদিককার ফরেস্ট বাংলো যযাশিপুরে একসময় একটা পোষা বাঘ ছিল, খৈরি। তার কথা আপনার মনে আছে?

বিনয়ভূষণ বললেন, হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? বছর কুড়ি আগেকার কথা। তখন আমি সবে চাকরিতে ঢুকেছি। দু-একবার দেখেছি বাঘটাকে। সেটার শেষ পর্যন্ত কী হল জানেন তো! বাঘটা এমনিতে শান্তই ছিল। ফরেস্ট অফিসার সরোজবাবু সেটাকে অনেকটা পোষ মানিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু বাঘ বলে কথা, অতি পাজি প্রাণী। অতবড় হাতি পর্যন্ত পোষ মানে, সিংহও পোষ মানে, কিন্তু বাঘ কিছুতেই মানুষের কথা শুনে চলতে রাজি নয়। একদিন হল কী, কলকাতা থেকে দুজন বাঙালিবাবু এসেছিলেন ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। সেইদিনই খৈরি বাঘটার মেজাজ বিগড়ে গেল! প্রথমে এক ভদ্রলোকের

কনুই খেয়ে ফেলল আধখানা। অন্য ভদ্রলোক কী যেন বলতে গিয়েছিলেন, অমনি বাঘটা তার দিকে তেড়ে গিয়ে প্রথমে জামাটা ছিঁড়ে দিল ফালা ফালা করে, তারপর ভদ্রলোকের বুকের উপর দুই থাবা রেখে কামড়ে দিল নাকে। কোনওরকমে বাঘটার গলায় শিকল বেঁধে তারপরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে আসা হল জঙ্গলে।

কাকাবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সন্তু আর জোজোর ঠোঁটেও হাসির ঢেউ।

বিনয়ভূষণ একটু আহতভাবে বললেন, আপনি স্যার আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, না, না, বিশ্বাস করব না কেন? তবে, আমিই সেই বাঙালিবাবু। অনেকদিন কেটে গেছে তো, তাই গল্পটা অনেক রং চড়ানো হয়ে গেছে। খৈরি আমার বুকের উপর দুই থাবা রেখে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু মোটেই আমার নাক কামড়ে দেয়নি। এই দেখুন, আমার নাক ঠিকই আছে। আমার জামাটাও ফালা ফালা করেনি, সে জামাটা এখনও রেখে দিয়েছি আমি। আর আমার বন্ধুর আধখানা কনুইও খেয়ে নেয়নি, শুধু একটা সঁাত ফুটিয়েছিল। আমার বন্ধু সেই হাতে এখনও টেনিস খেলে।

সন্তু বলল, তার পরেও তো বাঘটা ওখানে কিছুদিন ছিল।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, আমাদের জন্যই ওকে নির্বাসনে পাঠানো হয়নি। আরও বোধহয় মাস ছয়েক ছিল। কিন্তু আর কয়েকজনকে আক্রমণ করার পর বোঝা গিয়েছিল, ওকে আর রাখা যাবে না।

বিনয়ভূষণ বললেন, বাঘটাঘ দূর থেকে দেখাই ভাল। সিমলিপালে ওয়াচ টাওয়ারের ভাল ব্যবস্থা আছে।

জোজো বলল, আমি বাঘ দেখতেও চাই না, হাতি দেখতেও চাই না। আমি এই কটা দিন শুধু খাব আর ঘুমোব। এই রাস্তায় কোনও কচুরিশিঙাড়ার দোকান নেই? ওড়িশার কচুরি বিখ্যাত।

বিনয়ভূষণ বললেন, একটা ছোটমতন শহর পড়বে মাইলকুড়ি দূরে। সেখানে দু-একটা দোকান আছে।

এখন দুপাশে মিশমিশে অন্ধকার।

শুধু হেডলাইটের আলোতে দেখা যায় সামনেটা। মনে হয় রাস্তার দুধারে ঘন জঙ্গল।

গুরুপদ এতসব কথার মধ্যে একটা মন্তব্যও করেনি। গাড়ি চালাচ্ছে বেশ জোরে।

সে বোবা কি না পরীক্ষা করার জন্য কাকাবাবু বললেন, আপনি বড্ড জোরে চালাচ্ছেন ভাই। যদি রাস্তার উপর হাতিটাতি দাঁড়িয়ে থাকে, ব্রেক কষতে অসুবিধে হবে না?

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে গাড়ির গতি একটু কমিয়ে দিল।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি এ রাস্তাটা ভাল চেনা আছে?

সে এবার যেন দয়া করে উত্তর দিল, হুঁ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ি কি এই জেলায়?

এবারও সে বলল, হুঁ।

কাকাবাবু তার সঙ্গে আলাপ করার আশা ছেড়ে দিলেন।

বাইরে হাত বাড়িয়ে বললেন, একটুও হাওয়া নেই। গুমোট হয়ে আছে। একটু পরেই বোধহয় বৃষ্টি হবে।

সন্তু ভাবল, এই রে, এইবার কাকাবাবু তার প্রিয় গানটা গাইতে শুরু করবেন। তিনি যেন আর অন্য গান জানেনই না। এ গানও তার নিজের সুর দেওয়া।

শুনেছ কি বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ
টকটক থাকে না কো হলে পরে বিষ্টি
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি!

কিন্তু সন্তুকে অবাক করে দিয়ে গানের বদলে কাকাবাবু বললেন, আঠারোশো আটান্ন সালের জুন মাস। সেদিনও বোধহয় এরকমই গরম ছিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, সেই দিনটায় কী হয়েছিল?

কাকাবাবু বললেন, কী জানি! এমনিই মনে পড়ল।

বিনয়ভূষণ বললেন, আপনাদের স্যার কী প্ল্যান? কদিন থাকবেন এখানে? আমাদের বলে দিয়েছেন, আপনি যে-কদিন থাকবেন, আপনার দেখাশুনো করার দায়িত্ব আমার। আপনারা যেখানে যেতে চাইবেন, আমি নিয়ে যাব।

কাকাবাবু বললেন, এই রে! তা হলে তো খুব বিপদ! আমাদের মোটেই দেখাশুনো করতে হবে না। কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেওর নাম শুনেছেন তো? তিনি আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন, দিনতিনেক থাকব। সন্তুরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চায়, ওঁর বাড়ির গাড়িই নিয়ে যাবে।

বিনয়ভূষণ বললেন, কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও তো খুব অসুস্থ।

কাকাবাবু বললেন, তা জানি। সেইজন্যই আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। আমার সঙ্গে অনেকদিনের চেনা। শুনুন বিনয়বাবু, আমি যে এখানে এসেছি, তা খুব বেশি লোককে জানাতে চাই না। পুলিশের গাড়িতে ঘুরলে তো সবারই কৌতূহল হবে। সুতরাং

আমাদের পৌঁছে দেওয়ার পরই আপনার ছুটি। কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে আমি অনেক বারণ করেছিলাম, তবু সে জোর করে আপনাদের খবর পাঠিয়েছে।

বিনয়ভূষণ বললেন, স্যার, আপনি এ-রাজ্যের অতিথি। আপনার যাতে কোনও অসুবিধে না হয়, তা আমাদের দেখতে হবে অবশ্যই!

কাকাবাবু বললেন, ভঞ্জদেওদের বাড়িতে অতিথি হচ্ছি, ওঁরাই দেখাশুনো করবেন।

সন্তু বলল, যাঃ, হাতিটাতি তো কিছুই দেখা গেল না। শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা কুকুর।

জোজো বলল, আমি মোটেই হাতি দেখতে চাই না। আমার খিদে পেয়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, জোজোকুমারের কাছ থেকে আর কোনও গল্প শুনতে পাচ্ছি না।

সন্তু বলল, খিদে পেলে জোজোর গল্প বন্ধ হয়ে যায়।

গাড়ির চালক আবার গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠেছে জিপটা।

কাকাবাবু একটু বিরক্তভাবে বললেন, আমাদের গুরুপদবাবুর মনে হচ্ছে। বাড়ি ফেরার খুব তাড়া আছে। খারাপ রাস্তায় জোরে গাড়ি চালানো আমি মোটেই পছন্দ করি না।

পিছন থেকে বিনয়ভূষণ বললেন, ওহে গুরুপদ, স্যার বলছেন আস্তে চালাতে, তবু তুমি জোরে চালাচ্ছ কেন?

গুরুপদ সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দিয়ে পিছনে। হেলান দিল।

বিনয়ভূষণ বললেন, এ কী, থামালে কেন? থামাতে তো বলিনি, একটু আস্তে চালাতে বলেছি।

গুরুপদ নাক দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কথা বলেন না কেন? বিনয়ভূষণ বললেন, ও এইরকমই। একবার একটা খুব বড় অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিল, তারপর থেকেই! মুশকিল হয়েছে কী, লাস্ট মোমেন্টে আমাদের থানার ড্রাইভার জানাল যে, আসতে পারবে না, তার খুব পেট খারাপ হয়েছে। বাইশ বার নাকি বাথরুম গেছে সারাদিনে। আমি নিজে গাড়ি চালাতে জানি না, তাই ওকে আনতে হল। নইলে আমার সঙ্গে অন্য একজন সাবইনস্পেক্টরের আসার কথা ছিল।

কাকাবাবু বললেন, আমরা কি এখানে থেমেই থাকব?

বিনয়ভূষণ বললেন, না, না, এসব জায়গা মোটেই ভাল না। ও ভাই গুরুপদ, প্লিজ চলো, তোমাকে আমরা খারাপ কথা তো কিছু বলিনি, শুধু একটু আস্তে চালাবার অনুরোধ করেছি। চলো, চলো।

গুরুপদ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। একটু পরেই স্পিড বাড়াতে লাগল। আবার আগের মতন।

এক-একজন বোধহয় আস্তে গাড়ি চালাতে জানেই না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ যাওয়ার পর হঠাৎ গুরুপদ হেডলাইট অফ করে দিল। গাড়ি ছুটল সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে। আকাশেও কোনও আলো নেই।

বিনয়ভূষণ বললেন, এ কী, এ কী করলে? হেডলাইট খারাপ হয়ে গেল?

কোনও উত্তর নেই।

কাকাবাবু আদেশের সুরে বললেন, আপনি গাড়ি থামান! আপনার আর চালাবার দরকার নেই।

লোকটি তবু কোনও কথা বলল না, গাড়িও থামাল না।

একটু পরেই গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল কিছুর সঙ্গে। কাকাবাবু ছিটকে পড়ে গেলেন বাইরে।

পিছনের সিটের তিনজন একবার লাফিয়ে উঠে আবার পড়ল ধপাস করে।

জোজো চেঁচিয়ে উঠল, উঃ, উঃ, আমার হাত ভেঙে গেছে। আমার মাথা ফেটে গেছে!

জিপটা কিন্তু উলটে যায়নি। সেটা ধাক্কা মেরেছে একটা মোটা গাছে।

সন্তু কাকাবাবুকে বাইরে পড়ে যেতে দেখেছে। তাই একটু ধাতস্থ হয়েই সে লাফিয়ে বাইরে নেমে কাকাবাবুকে খুঁজতে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, কাকাবাবু!

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসেছেন। সন্তুর ডাক শুনে বললেন, এই যে, এখানে আমি!

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু আন্দাজে সন্তু কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, তোমার কোথায় লেগেছে?

কাকাবাবু বললেন, দাড়া, এক-এক করে মিলিয়ে নিই।

মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, চটচট করছে না, রক্তক্ত বেরোয়নি, তার মানে মাথা ফাটেনি। চোখ দুটো ঠিক আছে, নাক ঠিক আছে, দাঁত, একটা দাঁত নড়ে গেছে মনে হচ্ছে। হাত দুটোও তো ঠিক আছে দেখছি। শুধু বা হাতের বুড়ো আঙুলে ব্যথা। ও কিছু না, সামান্য।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, পা?

কাকাবাবু বললেন, আমাকে একটু ধর, উঠে দাড়াই, তারপর বুঝব?

দাঁড়িয়ে দুটো পা একবার করে মাটিতে ঠুকে বললেন, ঠিকই তো আছে মনে হচ্ছে। ডান পা-টা ভাঙলেই হয়েছিল আর কী! সারা জীবনের মতন পঙ্গু!

ততক্ষণে অন্যরাও এসে পড়েছে সেখানে। জোজো প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আপনার কী হয়েছে?

কাকাবাবু বললেন, কিছু হয়নি, খুব জোর বেঁচে গেছি!

জোজো বলল, আমার মাথা ফেটে গেছে আর হাত ভেঙে গেছে। সন্তু জোজোর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেখে নিয়ে বলল, রক্ত নেই। তুই ধাক্কা খেয়েছিস। মাথা ফাটেনি। কোন হাত ভেঙেছে বললি?

জোজো বাঁ হাতটা এগিয়ে দিতে সন্তু সে হাতটা ধরে একটা টান মারল। জোজো চেঁচিয়ে উঠল, উ উ উ, লাগছে,লাগছে, খুব লাগছে!

কাকাবাবু বললেন, কবজিটা মচকে যেতে পারে। যাই হোক, এক্স-রে করে দেখতে হবে।

বিনয়ভূষণ আর সন্তুরও তেমন কিছু আঘাত লাগেনি। তবে সন্তুর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, সেকথা সে কাউকে বলল না।

কাকাবাবু বললেন, ড্রাইভারের কী অবস্থা? তারই বেশি চোট লাগার কথা। তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্যাখো তো গাড়ির মধ্যে।

বিনয়ভূষণ আর সন্তু অন্ধকারের মধ্যে হাত দিয়ে দেখল, ড্রাইভারের সিটটা খালি।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো আমারই মতন ছিটকে বাইরে পড়ে গেছে। সন্তু, আমার হ্যান্ডব্যাগ থেকে টর্চটা বের কর।

টর্চ জ্বেলে দেখা গেল, ওপাশেও ড্রাইভার নেই।

বিনয়ভূষণ অনুচ্চ স্বরে ডাকলেন, গুরুপদ, গুরুপদ!

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। টর্চের আলোয় আশপাশের অনেকটা জায়গা খুঁজেও কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না গুরুপদর।

চিন্তিতভাবে বিনয়ভূষণ বললেন, সে তো আর বেশি দূরে পড়ে যেতে পারে না। গেল কোথায়?

জোজো বলল, এখন কী হবে? আমরা কী করে যাব? বিনয়ভূষণ বললেন, মহাবিপদে পড়া গেল! এখানে বেশিক্ষণ থাকা মোটেই উচিত নয়।

কাকাবাবু বললেন, এ-রাস্তায় আর কোনও গাড়িও তো চলছে না। বিনয়ভূষণ বললেন, সন্ধের পর এসব দিকে গাড়ি চলে না। শুধু দু- একটা ট্রাক যায়। কিন্তু হাতি আসার কথা রটে গেলে তারাও কোথাও থেমে যায়।

জোজো বলল, ওই তো একটা গাড়ি আসছে!

সত্যি দেখা গেল, এতক্ষণ বাদে উলটো দিক থেকে একটি গাড়ি আসছে। তীব্র হেডলাইট জ্বেলে।

বিনয়ভূষণ বললেন, এটা যদি পুলিশের গাড়ি হয়, বেঁচে যাব। অন্য গাড়ি হলে বিশেষ লাভ নেই।

সন্তু আর জোজো রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলতে লাগল, স্টপ, স্টপ। হেল্প, হেল্প!

সে-গাড়ির চালক কাছে এসে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেটা একটা স্টেশন ওয়াগন। ভিতরে কতজন যাত্রী তা বোঝা গেল না।

হর্ন বাজাতে বাজাতে গাড়িটা একেবারে কাছে এসে গেল, বোঝাই গেল সেটা থামবে না।

সন্তু আর জোজো দৌড়ে সরে গেল পাশের দিকে। বিনয়ভূষণ বললেন, জানতাম, গাড়িটা থামবে না। এই অঞ্চলে ডাকাতির ভয় আছে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু-জোজোর বয়সি ছেলেরাও ডাকাত হয়?

কী জানি, আজকাল হতেও পারে। যাই হোক, হাতির সঙ্গে যোগ হল ডাকাত।

সাপটাপ?

বিনয়ভূষণ বললেন, হ্যাঁ স্যার, অনেক সাপ আছে।

জোজো বলল, ওরে বাবা! সাপ! আমি গাড়িতে উঠে বসছি।

বিনয়ভূষণ বললেন, গুরুপদকে না পাওয়া গেলে গাড়িটা চালাবে কে?

তিনি আরও কয়েকবার গুরুপদর নাম ধরে ডাকলেন, টর্চের আলোও ঘুরিয়ে দেখলেন চতুর্দিকে।

কাকাবাবু বললেন, আগে দেখা যাক, গাড়িটা ঠিক আছে কি না।

বিনয়ভূষণ বললেন, কিন্তু চালাবে কে? আমি তো পারি না।

কাকাবাবু বললেন, সে না হয় আমিই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমি খোড়া মানুষ হলেও গাড়ি চালাতে অসুবিধে হয় না। তিনি ড্রাইভারের সিটে উঠে বসে চাবি ঘোরালেন।

প্রথম কয়েকবার বিদঘুটে শব্দ হল। যেন গাড়িটাও বলতে চাইছে, আমার মাথা ফেটে গেছে। হাত ভেঙে গেছে!

আসলে তেমন কিছু হয়নি। হঠাৎ ইঞ্জিন গরগর করে উঠল। কাকাবাবু ব্যাক করে গাড়িটাকে রাস্তায় তুলে আনলেন।

তারপর বললেন, সবাই উঠে পড়ো। বিনয়ভূষণ বসলেন সামনে, বাকি দুজন পিছনে।

কাকাবাবু বললেন, কী করব, এখন যাব? গুরুপদকে ফেলে রেখে? যদি কোথাও সে অজ্ঞান টজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে?

বিনয়ভূষণ বললেন, আর কোথায় থাকবে বলুন! অনেকখানি জায়গা তো খুঁজে দেখা হল। সেরকম ঝোপঝাড়ও নেই, শুধু বড় বড় গাছ।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু হেডলাইট জ্বালালেন। ঠিকই জ্বলে উঠল। শুধু একদিকের কাচ ভেঙে গেছে।

বিনয়ভূষণ বললেন, একী, হেডলাইট তো ঠিকই আছে। তখন নিভে গেল কী করে?

কাকাবাবু বললেন, নিভিয়ে দিলেই নিভে যায়।

জোজো বলল, কাকাবাবু, একটা কথা বলব? আমার মনে হয়, গাড়ির ড্রাইভার ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেন্টের একটু আগে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। তারপর দূরে সরে গেছে। তাই তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

কাকাবাবু বললেন, জোজো, তোমার অনুমানটাই বোধহয় ঠিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সে এরকম করল?

খিচিং পৌঁছোতে রাত সাড়ে নটা বেজে গেল।

ভঞ্জদেওদের বাড়িটি এককালে এক মস্ত বড় প্রাসাদ ছিল, এখন একেবারে ভগ্নদশা। অনেকখানি অংশ ব্যবহারই হয় না, ছাদ ভেঙে পড়েছে, গাছপালা গজিয়ে গেছে। শুধু সামনের দিকের কিছু অংশ সারিয়ে নতুন রং করা হয়েছে। বোঝা যায়।

গাড়িটা এ-বাড়ির সামনেই রইল। বিনয়ভূষণ হেঁটেই চলে গেলেন থানায়।

গেটের গাছে রয়েছে এক দরোয়ান, সে একেবারে বুড়ো থুথুড়ে, মাথায় আবার একটা ঢাউস পাগড়ি, হাতে একটা বর্শা। তার গোঁফ, দাড়ি এমনকী ভুরু পর্যন্ত তুলোর মতন সাদা।

সে কাকাবাবুদের নিয়ে গেল ভিতরের চাতালে।

সেখানে দুটি চেয়ারে বসে আছে একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে আর একটি তেরো-চোদ্দো বছরের মেয়ে। ছেলেটি ধুতি আর হাফ-হাতা সাদা গেঞ্জি পরা, আর মেয়েটি পরে আছে একটা চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। সেটা অনেকটা আলুথালু, ঠিক মতন এখনও শাড়ি পরতে শেখেনি বোঝা যায়।

ছেলেটি কাকাবাবুকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন, আসুন!

তারা দুজনেই কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু সন্তুদের বললেন, এ হচ্ছে প্রবীর, এখানকার ছোট রাজকুমার। আর এ তোমার বোন?

প্রবীর বলল, হ্যাঁ, আমার বোন কমলিকা। কাকাবাবু, আমাকে রাজকুমার বলে লজ্জা দেবেন না। রাজত্ব বা জমিদারি কিছুই নেই, দেখছেন তো বাড়ির অবস্থা! আমরা সাধারণ মানুষ।

কমলিকা বলল, আমাকে কেউ রাজকুমারী বললে শুনতে ভালই লাগবে। কিন্তু কেউ বলে না। দরোয়ানজি বলে খোকি, আর রান্নার মাসি বলে ছুটকি!

কাকাবাবু, সন্তু আর জোজোর সঙ্গে পরিচয় করাতে যেতেই কমলিকা বলল, দাড়ান, দাঁড়ান, দেখি আমি চিনতে পারি কি না। ওদের সব গল্পই

তো আমি পড়েছি!

তারপর সে সন্তুর গা ছুঁয়ে বলল, এই হচ্ছে সন্তু, আর ও জোজো।

জোজো বলে উঠল, হল না, হল না! আমি সন্তু আর ও জোজো!

কমলিকা বলল, এ জোজো? মুখ দেখে তো মনে হয় না, এ বানিয়ে বানিয়ে এত গল্প বলতে পারে!

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, আমি মোটেই বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলি না। সব সত্যি ঘটনা। সব ফ্যাক্ট! আমার বাবা একবার ইংল্যান্ডের রানিকে বলেছিলেন, আপনি নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজবেন। তাতে আপনার হাসিটা মিষ্টি দেখাবে। রানি এলিজাবেথ তার আত্মজীবনীতেও একথা লিখেছেন।

কাকাবাবু মিটিমিটি হাসছেন। এবার বললেন, চলো, আগে হাতমুখ ধুয়ে নেওয়া যাক। সারা গায়ে প্রচণ্ড ধুলো।

প্রবীর বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপরে চলুন। বাবা আপনাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন। আপনাদের অনেক দেরি হল। উনি ওষুধ খেয়ে নটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। কাল কথা বলবেন।

কাকাবাবু বললেন, এখন আর ওঁকে ডিসটার্ব করতে হবে না। আমাদের পৌঁছোতে খুবই দেরি হয়ে গেল।

প্রবীর বলল, আমাদের এক কাকা শুধু থাকেন এ বাড়িতে। তার নাম রুদ্রশেখর। তিনিও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। কাল উনি বাংরিপোসি গেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই ফিরবেন।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমরা তো দিনতিনেক থাকছি!

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, রাস্তা খারাপ ছিল?

কাকাবাবু বললেন, রাস্তা তো খারাপ ছিলই, তার চেয়েও বড় কথা, এক ড্রাইভারের পেট খারাপ, আর-এক ড্রাইভার অদৃশ্য।

প্রবীর ভুরু তুলে বলল, অদৃশ্য? তার মানে?

কাকাবাবু বললেন, এই সত্য ঘটনাটি জোজো পরে বলবে। এখন একটু চা খাওয়া দরকার।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখা গেল, একটা চওড়া বারান্দার একদিকের ভাঙা অংশ বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে। একটা কম পাওয়ারের বা জ্বলছে টিমটিম করে।

সন্তু জোজোকে বলল, এই সন্তু, দেখিস, যেন ভুল করে বারান্দার ওদিকটায় চলে যাস না। ধপাস করে নীচে পড়ে যাবি।

জোজো বলল, তুই-ই তো ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়াস, জোজো!

প্রবীর বলল, ওখানে একটা দড়ি বাঁধা আছে।

একটা ঘরের দরজা খুলে সে বলল, এই আপনাদের ঘর। আপনাদের একটু অসুবিধে হবে। বাথরুমটা একতলায়। আগেকার দিনে তো ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম থাকত না। দোতলায় যে একটা মাত্র বাথরুম ছিল, সেটা ভেঙে পড়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, সে ঠিক আছে। ঘরটা তো দেখছি প্রকাণ্ড!

প্রবীর বলল, আপনারা বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

ঘরটি সত্যিই প্রকাণ্ড। মাঝখানে একটি পুরনো আমলের খাট পাতা, যাকে বলে পালঙ্ক। তাতে অন্তত পাঁচজন মানুষ শুতে পারে। একপাশে রয়েছে একটা ড্রেসিং টেবিল। তার আয়নাটা অবশ্য ফাটা। আর একদিকে

কয়েকটা বেতের চেয়ার। একটা আলমারি ভরতি বাঁধাই করা মোটা মোটা বই।

এত বড় ঘরে একটি মাত্র জানলা।

জোজো বলল, কাকাবাবু, এরা এত ভাল বাংলা শিখল কী করে।

কাকাবাবু বললেন, ওরা তো কলকাতায় থাকে। প্রবীর পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে। ওর বোনও পড়ে কোনও ইসকুলে। এখানে কেউ থাকে না। সেইজন্যই তো বাড়িটার এই অবস্থা। এই খিচিং ছিল একসময় ময়ূরভঞ্জ রাজাদের রাজধানী। এখন কেওনঝড় এদিককার বড় শহর। প্রবীরের বাবা রাজা ছিলেন না, তবে রাজবংশেরই লোক। ওঁকে কেউ রাজাবাবু বা মহারাজ বললে উনি খুব চটে যান।

জোজো বলল, ভাঙা বাড়ি হলে কী হয়, একখানা যা দরোয়ান রয়েছে, দশজন ডাকাত এলেও সামলে দেবে!

কাকাবাবু হেসে ফেললেন।

সন্তু বলল, কাল সকালে ওর একটা ছবি তুলতে হবে! সান্টা ক্লজ সাজলে ওকে দারুণ মানাবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, জোজো, তুমি আর সন্তু যে উলটো নামের খেলা শুরু করলে, সেটা কি আগে ভেবে রেখেছিলে?

জোজো বলল, না। হঠাৎ মনে হল!

তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই এলিজাবেথের গল্পটা সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে ফেললি!

সন্তু বলল, হ্যাঁ। তবে ওটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, ফ্যাক্ট!

কাকাবাবু বললেন, তা হলে তোরও তো দেখছি উদ্ভাবনী শক্তি কম নয়। দেখি, তোরা কতক্ষণ এই খেলা চালাতে পারিস! জোজো তো একটা কুকুর দেখলেই ভয় পেয়ে যাবে! সন্তু আবার কুকুর ভালবাসে।

জোজো বলল, আমি কুকুর দেখলে ভয় পাই ঠিকই, কিন্তু সিংহ কিংবা গোরিলা দেখলে ভয় পাই না।

কাকাবাবু বললেন, দুঃখের বিষয়, ও দুটোর কোনওটাই এখানে নেই।

তাই পরীক্ষা করে দেখা যাবে না।

একটু বাদে বারান্দায় একটা ঘরর ঘরর শব্দ হল।

সন্তু দরজার কাছে এসে উঁকি মেরে দেখল, একটা ট্রলি ঠেলে ঠেলে আনছে কমলিকা।

তার উপর চায়ের পট, তিনটি কাপ, এক প্লেট সন্দেশ, এক প্লেট বিস্কুট আর এক প্লেট চানাচুর সাজানো।

ট্রলিটা নিয়ে ঘরে ঢোকার পর সে সন্তুকে বলল, ইয়ে, আমি কিন্তু দাদাটাদা বলতে পারব না, তোমাদের নাম ধরে ডাকতে পারি তো?

সন্তু বলল, পারো। কিন্তু আমার নাম ইয়ে নয়। কী বলো তো?

কমলিকা বলল, তুমি তো জোজো। আর ও সন্তু।

কাকাবাবু বললেন, আমি তোমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকব। তুমি এসব নিজে নিয়ে এলে? আর কেউ নেই?

কমলিকা বলল, রান্নার মাসি আছে। আর-একজন কাজের লোক জগোদাদা। কিন্তু আমাদের বাড়ির নিয়ম, বাড়িতে অতিথি এলে কাজের লোকের বদলে বাড়ির মেয়েদের নিজের হাতে খাবার দিতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, বেশ ভাল নিয়ম তো। তোমাকে কলকাতার বাড়িতে কখনও শাড়ি পরতে দেখিনি।

কমলিকা বলল, সেটাও এ-বাড়ির নিয়ম। এখানে সবসময় ছেলেদের শাড়ি আর মেয়েদের ধুতি পরে থাকতে হয়!

সন্তু আর জোজো হো হো করে হেসে উঠল।

কমলিকা লজ্জা না পেয়ে বলল, ভুল বলেছি, না? ছেলেরা ধুতি আর মেয়েরা শাড়ি। মেয়েরাও ধুতি পরে। যখন খুব বুড়ি হয় কিংবা উইডো হয়। উইডোর বাংলা কী?

সে সন্তুর দিকে তাকাতেই সন্তু জোজোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সন্তু বাংলা ভাল জানে!

জোজো বলল, উইডো হচ্ছে বিধবা। দ্য লেডি হু হ্যাজ লস্ট হার হাজব্যান্ড! পুরুষরা কিন্তু কখনও শাড়ি পরে না।

কমলিকা কাকাবাবুর হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়ে বলল, সন্দেশ খান। আর এই যেগুলো বিস্কুট মনে হচ্ছে, এগুলো আসলে নিমকি। এরকম গোল গোল নিমকি কলকাতায় পাওয়া যায় না।

কাকাবাবু বললেন, শুধু চা চেয়েছি, তুমি এত খাবার নিয়ে এলে? রাত্তিরে আর কিছু খেতে দেবে না বুঝি?

কমলিকা বলল, সে অনেক দেরি হবে। এই তো পোলাও রান্না শুরু হল।

কাকাবাবু জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, খাও, খিদে পেয়েছে। বলছিলে!

জোজো বলল, আমার মোটেই যখন-তখন খিদে পায় না। ওই জোজো বলেছিল।

কমলিকা ওদের দুজনের কাছে মিষ্টির প্লেট নিয়ে গিয়ে বলল, খাও। কাল তোমাদের কিচকেশ্বরীর মন্দিরে নিয়ে যাব। আজ মন্দিরে কী হয়েছে। জানো? বলো তো কী হয়েছে?

জোজো বলল, নরবলি দেওয়া হয়েছে।

সন্তু বলল, মূর্তির চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছে!

কমলিকা বলল, হল না। পাশের পুকুরটা বুজে গিয়েছিল, তাই ডিগ করা হচ্ছিল কদিন ধরে। ডিগের বাংলা কী?

জোজো বলল, খোঁড়াখুঁড়ি। অত তোমাকে সব কথার বাংলা জানতে হবে না। আমরা বুঝতে পারলেই হল। তারপর?

কমলিকা বলল, আজ মাটির তলা থেকে একটা মানুষের মাথার খুলি আর সাতটা লোহার সিন্দুক পাওয়া গেছে।

কাকাবাবু বললেন, সাতটা লোহার সিন্দুক?

কমলিকা বলল, না, না, একটা লোহার সিন্দুক আর সাতটা মাথার খুলি। সেই সিন্দুকটা খোলা যায়নি। ভিতরে কী আছে, কেউ জানে না।

জোজো বলল, গুপ্তধন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সিন্দুকটা কোথায়?

কমলিকা বলল, এ-বাড়িতেই রাখা হয়েছে। কাল বাবার সামনে সেটা হাতুড়ি মেরে ভাঙা হবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, আর সাতটা মাথার খুলি? সেগুলো কোথায় রাখা হয়েছে? এ-বাড়িতেই?

কমলিকা বলল, ভ্যাট! বাড়িতে কেউ ওসব রাখে? তা হলে তোমরা ভূতের ভয় পেতে না? সেগুলো আছে মন্দিরে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুমি বুঝি ভূতের ভয় পাও না?

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, আমি কোনও কিছুতেই ভয় পাই না। শুধু…

জোজো বলল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বলছি। মাকড়সা? তাই না?

কমলিকা মাথা নেড়ে বলল, টিকটিকি!

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি নীচের বাথরুমে যাব, হাত-মুখ ধুতে হবে। সিন্দুকটাও একবার দেখব, সেটা কোথায় রাখা আছে?

সবাই নেমে এল একতলায়। প্রবীরও যোগ দিল ওদের সঙ্গে।

নীচে অনেক ছোট ছোট ঘর। আগেকার দিনে কর্মচারী আর পাহারাদাররা থাকত। এখন সবই খালি, দেওয়ালগুলোর প্লাস্টার খসে গিয়ে হাড়গোড়

বেরিয়ে পড়েছে। দরজাও ভাঙা।

একটা ঘরে সিন্দুকটা রাখা আছে, সে ঘরে আলো নেই।

কাকাবাবু টর্চ জ্বেলে দেখতে লাগলেন। সিন্দুকটা বেশ বড় আর চৌকো ধরনের। গায়ে শ্যাওলা ধরে গেছে। কিন্তু কোথাও ফুটোটুটো হয়নি। সামনের দিকে ঝুলছে দুটো পেল্লায় আকারের পেতলের তালা।

সিন্দুকের চারটে পায়ার একটা ভাঙা, তাই একদিকে হেলে আছে। অন্য পায়াগুলো বাঘ কিংবা সিংহের পায়ের মতন।

কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, ভাল করে টর্চটা ধর তো? তিনি একটা রুমাল বের করে উপর দিকটায় ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আস্তে আস্তে সেখানে একটা ছবি ফুটে উঠল। অস্পষ্ট হলেও চেনা যায়, গণেশের ছবি। তার তলায় কিছু লেখা আছে।

কাকাবাবু বললেন, মনে হচ্ছে সংস্কৃত লেখা। কাল সকালে ভাল করে দেখতে হবে।

প্রবীর বলল, এটা পাওয়া গেছে পাঁচদিন আগে।

কাকাবাবু বললেন, পাঁচদিন! কমলিকা যে বলল, আজই!

প্রবীর বলল, আজ তোলা হয়েছে। দেখা গিয়েছিল পাঁচদিন আগে। মাটির মধ্যে এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, তোলাই যাচ্ছিল না। একবার তো খানিকটা তোলার পর ধপাস করে পড়ে গিয়ে আবার গেঁথে গেল অনেকটা। আজ দশ-বারোজন লোক তুলেছে অতি কষ্টে।

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, পাঁচদিন আগে? তার মানে, অনেক লোক এটার কথা জেনে গেছে।

প্রবীর বলল, হ্যাঁ, আশপাশের গ্রামের লোক ছুটে এসেছে দেখার জন্য। আজও প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। এইসব সিন্দুকটিক দেখলেই লোকে ভাবে, ভিতরে অনেক হিরে-জহরত, চুনি-পান্না আছে।

কাকাবাবু বললেন, তা তো ভাবতেই পারে।

কমলিকা বলল, যদি পান্না থাকে, তা হলে আমি একটা নেব। আমি কখনও পান্না দেখিনি।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, পান্না কী রঙের হয় জানো?

কমলিকা বলল, বোধহয় নীল, তাই না?

সন্তু বলল, সবুজ। আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

কাকাবাবু বললেন, হিরে-জহরতের বাক্স অনেক ছোট হয়। এত বড় সিন্দুক ভরাতে গেলে তো সাত রাজার ধন লাগবে! আমার মনে হয়, এইসব সিন্দুকে দলিলটলিল, জমিদারির কাগজপত্র রাখা হত।

জোজো বলল, হয়তো সিন্দুকে কাগজপত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হত গয়নার বাক্স।

প্রবীর বলল, কাল খুললেই দেখা যাবে। এর মধ্যে যদি দামি জিনিস কিছু থাকে, তা কিছুই আমরা পাব না, বাবা বলে দিয়েছেন। বাবাকে তো জানেন, কোনও জিনিসের প্রতি লোভ নেই। বাবা আগেই বলে রেখেছেন, দামি কিছু পাওয়া গেলে থানায় জমা দিতে হবে। সব গুপ্তধনই গভর্নমেন্টের প্রপার্টি।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে সিন্দুকটাই থানায় জমা রাখা উচিত ছিল।

প্রবীর বলল, আমরা তো কিছু বলিনি, মন্দিরের পুরুতরাই এটা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসলে কী জানেন, বেশিরভাগ মানুষই পুলিশদের বিশ্বাস করে না। পুলিশের মধ্যে তো অনেক চোর থাকে। এখানকার সবাই জানে, বাবা হান্ড্রেড পারসেন্ট সৎ মানুষ।

কাকাবাবু বললেন, তা আমিও জানি। এই একতলায় রাত্তিরে কে থাকে?

প্রবীর বলল, এ আমাদের দরোয়ান নটবর সিংহ। বুড়ো হয়েছে, কিন্তু বাবা ওকে কিছুতেই চাকরি ছাড়াবেন না। ও-ও কিছু কাজ না করে মাইনে নেবে না। পাহারা দেবেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সারারাত জাগে?

প্রবীর বলল, সেটা কি ওর বয়সে সম্ভব? এ-বাড়িতে চুরি করার মতন তো কিছু নেই আর। দামি জিনিস সব কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাদের আর-একটা বাড়ি আছে ভুবনেশ্বরে। রুদ্রকাকা ওখানে থাকেন, এখানেও থাকেন।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, এখন তো আর কিছু করা যাবে না। দেখা যাক, কাল সকালে কী হয়!

রাত্তিরের খাওয়া দাওয়া সারতে অনেক রাত হয়ে গেল। অনেক রকমের রান্না, তার মধ্যে আছে পোলাও, কোপ্তা, পায়েস। গুরুভোজন যাকে বলে।

তারপর খানিকক্ষণ গল্প হল খাওয়ার ঘরে বসেই। তার মধ্যে হঠাৎ টিক টিক করে একটা টিকটিকি ডেকে উঠতেই কমলিকা ভয়ে জড়িয়ে ধরল তার দাদাকে।

প্রবীর হাসতে হাসতে বলল, দেখেছেন তো, কী ভিতু এই মেয়েটা! প্রত্যেক দিন শোওয়ার আগে সারাঘর আমাকে খুঁজে দেখতে হয়, একটাও টিকটিকি আছে কিনা। পুরনো বাড়ি। টিকটিকি তো থাকবেই।

কমলিকা বলল, এইজন্যই আমি এখানে আসতে চাই না। কলকাতাই ভাল।

সন্তু বলল, কলকাতা শহর বুঝি টিকটিকি শূন্য?

প্রবীর বলল, আমি তো জানি, পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই, যেখানে টিকটিকি নেই। এরা খুব প্রাচীন প্রাণী।

কাকাবাবু হাই তুলে বললেন, এবার শুয়ে পড়া যাক!

প্রবীর জিজ্ঞেস করল, আপনারা ওই এক খাটে শুতে পারবেন? আরএকটা ঘরেও ব্যবস্থা করা আছে। তবে সে ঘরের একটা জানলার একটা পাল্লা ভাঙা।

জোজো বলল, না, না, আমরা এক খাটেই শোব। এত বড় খাট, ফুটবল খেলা যায়।

কাকাবাবু আর সন্তু দুপাশে, মাঝখানে জোজো। আলোটা নিভিয়ে দেওয়ার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আমরা এখানে কেন এসেছি?

কাকাবাবু বললেন, পুকুরের মধ্যে একটা তালাবন্ধ সিন্দুক, সাতটা মাথার খুলি, এসব কিছুই আগে জানতাম না। সুতরাং ওইসব রহস্য সমাধানে আসিনি। ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। এসেছি বেড়াতে। কাছাকাছি অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। প্রবীরের বাবা নেমন্তন্ন করেছেন অনেকবার। ভদ্রলোক খুব অসুস্থ। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবেন না, তাই এবারেই দেখা করতে আসা।

সন্তু বলল, আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করব? আঠারোশো আটান্না সালের জুন মাসে কী হয়েছিল? তুমি হঠাৎ বলে উঠলে...?

কাকাবাবু বললেন, তুই মনে রেখেছিস দেখছি। আটান্নর এক বছর আগে, আঠারোশো সাতান্ন সালে কী হয়েছিল জানিস?

জোজো বলল, সিপাই বিদ্রোহ!

কাকাবাবু বললেন, সাহেবরা বলত, সিপয় মিউটিনি, তার থেকে বাংলায় লেখা হত সিপাই বিদ্রোহ। পরে অনেকে বলেছে, ওটাই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ। সিপাইরাই প্রথম বিদ্রোহ শুরু করেছিল বটে, পরে অনেকেই যোগ দেয়।

সন্তু বলল, শুরু হয়েছিল তো আমাদের ব্যারাকপুরে। মঙ্গল পাণ্ডে...

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ছিলেন মঙ্গল পাণ্ডে, তাতিয়া টোপি, ঝাঁসির রানি লছমিবাই, বিঠুরের নানাসাহেব, দিল্লির শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর। এঁদের মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডেকে প্রথমেই মেরে ফেলা হয়, ঝাসির রানি লছমিবাই আত্মহত্যা করেন। লোকে বলে তিনি ঝাঁসির দুর্গ থেকে ঘোড়াসুদ্ধ নীচে লাফিয়ে পড়েছিলেন। তাঁতিয়া টোপি অনেকদিন পর ধরা পড়েন, তাঁকে একটা কামানের মুখে

বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাহাদুর শাহকে পাঠানো হয় নির্বাসনে। কিন্তু নানাসাহেবের কী হল? সেটা আমাদের ইতিহাসের একটা রহস্য। নানাসাহেবের আর কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি।

জোজো বলল, ওসামা বিন লাদেনের মতন!

কাকাবাবু বললেন, ওসামা বিন লাদেন লুকিয়ে আছে, তা তো বেশিদিন হয়নি। এখনও ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নানাসাহেব তো অনন্তকাল বেঁচে থাকতে পারেন না। কিন্তু তার মৃত্যু সংবাদও পাওয়া যায়নি।

সন্তু বলল, আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতন অনেকটা।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, নেতাজিও এতদিন বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু কোথায় কীভাবে তার মৃত্যু হল, তা আজও রহস্যময়। তাইহোকু বিমানবন্দরে প্লেনে আগুন লেগে গেল, না তিনি জাপানে চলে গেলেন, কিংবা রাশিয়ানদের হাতে বন্দি হলেন, না ইংরেজরা গোপনে মেরে ফেলল, তা জানা গেল না। যুদ্ধ শেষের পর তিনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন।

সন্তু আবার বলল, নানাসাহেব কোথায় লুকিয়েছিলেন, তুমি বুঝি তা জানতে পেরেছ?

কাকাবাবু বললেন, না। খোঁজাখুঁজি করছি।

জোজো বলল, নানাসাহেব কি এই ঘিসিং-এ এসে লুকিয়েছিলেন? এমন হতে পারে?

সন্তু বলল, ঘিচিং নয়, খিচিং।

কাকাবাবু বললেন, হতেও পারে। তিনি কোনও-না-কোনও স্বাধীন রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন অবশ্যই। ইংরেজরা তো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে কম খোঁজাখুঁজি করেনি! এইসব অঞ্চলে তখন ইংরেজ শাসন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাস্তাঘাটও ছিল

দুর্গম। এরকম জায়গায় লুকিয়ে থাকা সম্ভব। অনেকের ধারণা, নানাসাহেব বাকি জীবনটা ছদ্মবেশে নেপালে কাটিয়েছেন। কিন্তু আমি নেপালে গিয়ে অনেক খোঁজ করেছি, সেরকম কোনও প্রমাণ মেলেনি।

সন্তু বলল, এসব তো বহু বছর আগেকার কথা। তুমি এখন খোঁজ করছ কেন?

কাকাবাবু বললেন, এমনিই, কৌতূহল। নেতাজির মৃত্যু নিয়ে তো এখনও তদন্ত চলছে। আমার বন্ধু সাধন রায় সিপাই যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে একটা নতুন বই লিখছেন। তাকে আমি একটু সাহায্য করতে চাই! অনেক কথা হয়েছে। এবার ঘুমো।

জোজো বলল, লোহার সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে, তা জানার জন্য খুব কৌতূহল হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, কাল সকালে প্রথম কাজ হবে আমাদের ড্রাইভার গুরুপদর খোঁজ করা।

এইসময় হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। সারাদিন অসহ্য গরমের পর জানলা দিয়ে এল ঠান্ডা হাওয়া। সেইসঙ্গে বৃষ্টির ছাঁট।

প্রথম প্রথম ভালই লাগল, তারপর বিছানা ভিজতে শুরু করায় জানলাটা বন্ধ করতেই হল। তারপর আবার গরম।

৩. সকালবেলা প্রথম ঘুম ভাঙল সন্তুর

সকালবেলা প্রথম ঘুম ভাঙল সন্তুর, নীচে চেঁচামেচি শুনে।

সন্তু খাট থেকে নেমে জানলাটা খুলে দিল। প্রথমেই চোখে পড়ল, বাড়ির সামনের দিকটায় আর রাস্তায় বেশ জল জমে আছে। বৃষ্টি হয়েছে সারারাত। গাছপালাগুলো স্নান করে সেজেগুজে আছে।

নীচে তিন-চারজন লোক কথাবার্তা বলছে উত্তেজিতভাবে। আর-একজন কেউ কাঁদছে।

সন্তু অন্যদের না জাগিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। অন্য ঘরগুলোর দরজা বন্ধ, দোতলায় আর কারও ঘুম ভাঙেনি বোধহয়।

নীচে এসে দেখল, গোরু নিয়ে হাজির হয়েছে গয়লা আর কাপড়ের বস্তা কাধে একজন ধোপা। জগোদাদা আদ্ধেক দাঁত মেজেছে, আঙুলে ছাই লাগা। আর হাউ হাউ করে কাঁদছে বৃদ্ধ দরোয়ান নটবর সিংহ।

সন্তু ওদের কাছে দাঁড়িয়ে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ঘটনাটা জেনে গেল।

লোহার সিন্দুকটা চুরি গেছে। যারা চুরি করতে এসেছিল, তারা নটবর সিংহের হাত-পা-মুখ বেঁধে রেখেছিল। সকালবেলা প্রথমে গয়লা এসে ওই

অবস্থায় নটবর সিংহকে দেখে খুলে দিয়েছে বাঁধন। সন্তু ভিতরে গিয়ে সিন্দুকের ঘরটা দেখে এল।

অতবড় সিন্দুকটা ঘষটে ঘষটে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, মেঝেতে দাগ পড়ে গেছে। আর কোনও চিহ্ন নেই।

সন্তু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, কাকাবাবু উঠে বসেছেন।

সন্তু কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, কী, সিন্দুকটা চোরে নিয়ে গেছে তো?

সন্তু মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, কাল রাত্তিরেই আমার এ-কথা মনে হয়েছিল। হাজার হাজার লোক এসে দেখেছে সিন্দুকটা। অনেকেরই ধারণা, ওর মধ্যে গুপ্তধন

আছে। চোরেদের তো লোভ হবেই।

সন্তু বলল, এখন কী হবে?

কাকাবাবু কাঁধ কঁকিয়ে বললেন, কী আর হবে? আমাদের কি সারারাত ধরে ওটা পাহারা দেওয়ার কথা ছিল? আমরা তো সেজন্য এখানে আসিনি!

সন্তু বলল, সিন্দুকটার মধ্যে কী ছিল, তা জানাই গেল না।

কাকাবাবু পালঙ্ক থেকে নেমে বললেন, এখন যে একটু চা দরকার। কাল বেড টি-র কথা বলতে ভুলে গেছি। প্রবীরদের কাউকে দেখতে পেলি?

সন্তু বলল, না। জগোদাদা রয়েছে নীচে। আর কেউ জাগেনি।

কাকাবাবু বললেন, কাল সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। তাতে খুব সুবিধে হয়েছে চোরদের। সবাই জানলা বন্ধ করে শুয়েছে, কেউ কোনও সাড়াশব্দ পায়নি।

একটু পরেই ছুটতে ছুটতে এল কমলিকা।

চোখ বড় বড় করে বলল, কাকাবাবু, কী হয়েছে জানেন? যাঃ, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, কী হয়েছে?

কমলিকা বলল, নীচে চলুন, দেখবেন চলুন!

কাকাবাবু বললেন, কী দেখব?

কমলিকা বলল, লোহার সিন্দুকটা নেই।

কাকাবাবু বললেন, না থাকলে আর নীচে গিয়ে দেখব কী করে?

কমলিকা বলল, সেটা চুরি হয়ে গেছে!

কাকাবাবু বললেন, চুরি হয়ে গেলে তো দেখা যাবে না ঠিকই!

কমলিকা বলল, বাঃ, কে চুরি করল আপনি দেখবেন না?

কাকাবাবু বললেন, আমি কী করে চোরকে দেখব? সে কি আমার জন্য বসে আছে?

কাকাবাবুর ঠান্ডা ব্যবহারে কমলিকা বেশ নিরাশ হল। সে ভেবেছিল, চুরির খবর শুনেই কাকাবাবু হন্তদন্ত হয়ে নেমে যাবেন।

কাকাবাবু আবার বললেন, সেই যে রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নাটকে একটা গান আছে:

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে
চোর চাই
যে করেই হোক, চোর চাই
হোক না সে যে-কোনো লোক
চোর চাই
নইলে মোদের যাবে মান...

বেসুরো গলায় গুনগুনিয়ে এইটুকু গান গেয়ে কাকাবাবু বললেন, ওহে। রাজকুমারী, চোর ধরা তো পুলিশের কাজ। আমি পুলিশও নই, আমি ডিটেকটিভও নই। তোমার বাবা নেমন্তন্ন করেছেন বলে এসেছি এখানে।

কমলিকা তখন সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই জোজো, তুমি এতদিন কাকাবাবুর সঙ্গে থেকে কিছু শেখোনি?

সন্তু বলল, পটৌডির নবাবের বেগমসাহেবার যখন হিরের নেকলেস চুরি গেল, তখন কাকাবাবু ছিলেন বিদেশে, আমরা ভোপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন আমিই তো বলেছিলাম, নেকলেসটা কোনও সাধারণ চোর চুরি করেনি, নিয়েছে একটা বাঁদর। ওখানে খুব বাঁদরের উৎপাত। ঠিক একটা বাঁদরের গলা থেকে পাওয়া গেল!

কাকাবাবু অবাক হয়ে সন্তুর কথা শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন,

নেকলেসটা হিরের ছিল, না মুক্তোর? বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা!

সন্তু কমলিকার দিকে তাকিয়ে বলল, পটৌডির বেগমসাহেবা কে জানো তো? শর্মিলা ঠাকুর!

কমলিকা বলল, সত্যি?

সন্তু বলল, সত্যি না তো কী? ফ্যাক্ট!

কাকাবাবু বললেন, রাজকুমারী, কাল রাত্তিরে চোর এসেছিল বলে কি আমরা সকালে চা পাব না? আমার ঘুম ভাঙলেই খুব চায়ের তেষ্টা পায়।

কমলিকা বলল, আমি এক্ষুনি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

সে বেরিয়ে যেতেই কাকাবাবু হাসতে হাসতে সন্তুকে বললেন, তুই যে জোজোকেও টেক্কা দিচ্ছিস রে সন্তু! বাঁদরের গলায় শর্মিলা ঠাকুরের নেকলেস? তবে এইসব গল্প

জোজোকেই বেশি মানায়। এবার তোরা নাম বদলের খেলা শেষ করে দে। আমিই ভুল করে তোকে সন্তু বলে ডেকে ফেলব!

জোজো এখনও ঘুমোচ্ছে। সন্তু তার গায়ে হাত রেখে ডাকল, কী রে, এখনও উঠবি না?

জোজো চোখ পিটপিট করে বলল, আমি আগেই জেগে গেছি। সব শুনছি! সন্তুটা কী গুলবাজ দেখলেন? আমিই তো ওকে ভোপালে নিয়ে গিয়েছিলাম। ও কি ভোপালের নবাবকে চিনত? পটৌডি তো আমাদের বাড়িতে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেকবার এসেছে। বাঁদরটা যখন মুক্তোর মালাটা চুরি করল, তখন আমিই তো, মানে বাঁদরটাকে ধরাই যাচ্ছিল না। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে লাফিয়ে পালাচ্ছিল, আমিই তো হিপনোটাইজ করে বাঁদরটাকে মাটিতে নামিয়ে আনলাম, সন্তু সে-কথা বললই না!

সন্তু বলল, এবার থেকে তুই একাই সব বলবি।

কাকাবাবু বললেন, তোরা দুই বন্ধুতে চেষ্টা করে দ্যাখ না, যদি এই সিন্দুক-রহস্য কিছু সমাধান করতে পারিস। আমি ওটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা।

সন্তু বলল, নানাসাহেব!

একটু বাদেই কমলিকা চায়ের ট্রে নিয়ে এল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা ঘুম থেকে উঠেছেন?

কমলিকা বলল, হ্যাঁ, এইমাত্র। আপনাদের কিন্তু ঠিক নটার সময় ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, তারপর আমি একবার মন্দিরটা দেখতে যাব।

পরপর দুকাপ চা খেয়ে কাকাবাবু টয়লেটের জন্য নামলেন নীচের তলায়।

বাড়ির সদর দরজার সামনে এখন আরও অনেক লোকের ভিড় জমে। গেছে। তক্ষুনি সাইকেল চেপে এসে পড়লেন বিনয়ভূষণ মহাপাত্র।

বিনয়ভূষণ বললেন, নমস্কার, রায়চৌধুরীবাবু। শরীরটরির সব ঠিক আছে তো?

কাকাবাবু প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, সব ঠিক আছে। বিনয়ভূষণ বললেন, কী কাণ্ড বলুন দেখি, আপনি এখানে উপস্থিত থাকতেও সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেল?

কাকাবাবু বললেন, আপনি তো কাল আমায় এই সিন্দুকটার কথা কিছু বলেননি

বিনয়ভূষণ ভুরু তুলে বললেন, সে কী! আমি তো ধরেই নিয়েছি, আপনি সব জানেন। আপনার সাহায্য নেওয়ার জন্যই কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও আপনাকে এখানে আনিয়েছেন। নইলে এত ছোট জায়গায় কেউ কি বেড়াতে আসে?

কাকাবাবু একটু বিরক্তভাবে বললেন, আমি এই সিন্দুকটার কথা কিছুই জানতাম না। সিন্দুক পাহারা দেওয়া আমার কাজ নয়।

বিনয়ভূষণ বললেন, চলুন স্যার, ভিতরে গিয়ে দেখি চোরেরা অত ভারী জিনিসটা কীভাবে সরাল।

কাকাবাবু বললেন, আপনি গিয়ে দেখুন। তাতেই হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের গাড়ি যে চালাচ্ছিল, গুরুপদ রায়, তার কী খবর?

বিনয়ভূষণ বললেন, সে সারারাত বাড়ি ফেরেনি। আজ সকালেও তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছি, তার কোনও খবর নেই, তবে ও মাঝে মাঝেই এরকম করে। কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যায়। আমাদের থানার ড্রাইভার ভাল হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে এসেছি, জিপটা ফেরত নিয়ে যাবে।

একজন লোক জিপগাড়িটা স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে। কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন সেদিকে।

লোকটি কাকাবাবুর কথা আগেই শুনেছিল বোধহয়, তাই সে কঁচুমাচু মুখে বলল, প্রণাম নেবেন স্যার, আমি কাল যেতে পারিনি, মাপ করবেন।

কাকাবাবু বললেন, আপনার তো শরীর খারাপ হয়েছিল। এখন কেমন আছেন?

ড্রাইভার বলল, একদম ভাল হয়ে গেছি। আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, কাল চব্বিশ বার ইয়েতে যেতে হয়েছিল, প্রায় মরেই যাচ্ছিলাম, বাড়ির লোক ভয় পেয়ে ডাক্তার ডেকে আনল। ডাক্তারবাবু একটামাত্র ওষুধ দিলেন, তাই খেয়েই সব বন্ধ হয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, খুব ভাল ডাক্তার তো!

ড্রাইভার বলল, ডাক্তারবাবু কী বললেন জানেন? বললেন, এই ওষুধটা খেয়ে যদি তোমার ইয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে বুঝবে, তোমার ফুড পয়জনিং হয়েছে, ভয়ের কিছু নেই। আর যদি না কমে, তোমাকে হাসপাতালে যেতে হবে। কমে গেল, তাই হাসপাতালে যেতে হল না।

কাকাবাবু বললেন, এক ওষুধেই কমে গেল? ফুড পয়জনিং, বাড়িতে। আর কারও কিছু হয়নি?

ড্রাইভার বলল, সেইটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার স্যার। আমার বাড়িতে অনেক লোক, সবাই একই খাবার খেয়েছি। ডাল, ভাত আর ঝিঙে-পোস্ত। আমরা মাছ-মাংস খাই না, বাড়িতে আসেই না। আমার মা রান্না করেন। আমার মায়ের রান্নার সুখ্যাতি আছে। বাড়ির আর কারও কিছুই হয়নি। শুধু আমারই একার...

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাইরে কিছুই খাননি?

ড্রাইভার বলল, না স্যার। আমার দোকানের খাবার খাওয়ার অভ্যেস নেই। বাড়িতেই খাই। তবে, মাঝে মাঝে চা খাই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাল কোন দোকানে চা খেয়েছিলেন?

ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ, আমাদের থানার কাছেই একটা ছোট চায়ের দোকান, শুধু এক কাপ চা খেয়েছিলাম। বিস্কুট টিস্কুটও কিছু খাইনি। চা খেলে কি ফুড পয়জনিং হয়? কত লোকই তো এ-দোকানে চা খায়।

কাকাবাবু বললেন, ওই দোকানে সে-সময় আপনার চেনাশুনো কেউ ছিল?

ড্রাইভার বলল, হ্যাঁ, ছিল কয়েকজন!

কাকাবাবু বললেন, গুরুপদ ছিল?

ড্রাইভার খানিকটা অবাক হয়ে বলল, গুরুপদ? হ্যাঁ স্যার, সে দাঁড়িয়েছিল দোকানের সামনে, আমাকে রাস্তায় দেখে ডেকে বলল, এসো, এক কাপ চা খেয়ে যাও?

কাকাবাবু বিনয়ভূষণের দিকে ফিরে বললেন, এবার বুঝলেন, কেন কাল আমাদের গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?

কাকাবাবু ড্রাইভারের পেটখারাপ নিয়ে এত খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করছেন দেখে বিনয়ভূষণ বেশ অবাকই হচ্ছিলেন। এখন বললেন, ও কিন্তু সব সত্যি কথা বলছে স্যার। সত্যিই ওর আর কাল বাড়ি থেকে বেরোনোর মতন অবস্থা ছিল না।

কাকাবাবু বললেন, সত্যি কথা বলছে বলেই তো আসল কারণটা বোঝা গেল। গুরুপদ ওকে ডেকে নিয়ে গেছে চায়ের দোকানে। তারপর ওর চায়ের সঙ্গে অনেকখানি জোলাপ মিশিয়ে দিয়েছে। যাতে ওকে বারবার বাথরুমে যেতে হয়, আর গাড়ি চালাতে না পারে। আপনারা বাধ্য হয়ে তখন গুরুপদকে নিলেন।

বিনয়ভূষণ বললেন, ও নিজেই এসেছিল থানায়। মাঝে মাঝে আমরা ওকে কিছু কিছু কাজ দিই। ও যে গ্যারাজে কাজ করে, সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া নিতে হয়। কাল থানায়

এসে বলল, স্যার, অনেকদিন আমায় কোনও কাজ দেননি। আমি ভাবলাম, ভালই হল, ও গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, তারপর গুরুপদ ইচ্ছে করে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগাল, তার আগে লাফিয়ে নেমে পড়ল নিজে। আমাদের হয়তো একেবারে মেরে ফেলতে চায়নি। খানিকটা আহত টাহত হতে পারি। আসল ব্যাপার হল, ও ভেবেছিল, বিনয়ভূষণ গাড়ি চালাতে জানেন না, আমিও খোঁড়া মানুষ, গাড়ি ড্রাইভ করতে পারব না, গাড়িটাও আর স্টার্ট না নিতে পারে। অর্থাৎ রাত্তিরের মধ্যে আমরা এখানে পৌঁছোতে পারব না। সেটাই গুরুপদর উদ্দেশ্য ছিল।

বিনয়ভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, কেন? এতে ওর লাভ কী?

কাকাবাবু বললেন, ওর পিছনে অন্য কেউ আছে। বা কোনও দল। তারা ঠিক করেছিল, আমাদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে লোহার সিন্দুকটা রাজবাড়ি থেকে চুরি করবে।

বিনয়ভূষণ বললেন, আমারও ধারণা ছিল, আপনি সিন্দুকটা দেখার জন্যই এখানে আসছেন। কিন্তু স্যার, আপনি গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেলেন, তাও তো চুরি হয়ে গেল সিন্দুক। ওর ভিতরে কত ধন-সম্পদ আছে কে জানে!

কাকাবাবু বললেন, আমি তো সিন্দুকটা পাহারা দেওয়ার জন্য আসিনি। ওটার কথা জানতামই না।

বিনয়ভূষণ বললেন, সিন্দুকটা থানায় জমা দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে আর এই ঝামেলা হত না।

কাকাবাবু বললেন, হু। পুকুর খোঁড়ার সময় সিন্দুকটা দেখা গিয়েছিল পাঁচদিন আগে, সেটা ওখানে ফেলে রাখা হয়েছিল কেন এই কদিন?

বিনয়ভূষণ বললেন, জিনিসটা খুব ভারী, কাদার মধ্যে এমনভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তোলা খুব শক্ত ছিল। তা ছাড়া মাঝখানে একটা লক্ষ্মীপুজো পড়েছিল বলে দুদিন কোনও কাজ হয়নি। লক্ষ্মীপুজোর মেলা হয়।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার কাজ করুন। আমি যাচ্ছি ভিতরে।

বিনয়ভূষণ বললেন, কিছু দরকার লাগলে বলবেন স্যার। এইসময় আর-একটা জিপগাড়ি এসে থামল। জিন্স আর কোমরে গোঁজা লাল রঙের ফুলহাতা শার্ট-পরা একজন লম্বামতন লোক সেই জিপ থেকে নেমে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল এদিকে।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে বলল, নমস্কার! আপনি নিশ্চয়ই। কাকাবাবু, মানে রাজা রায়চৌধুরী? আপনার সঙ্গে ক্রাচ দেখে বুঝেছি।

কাকাবাবুও নমস্কার করে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই রুদ্রকুমার ভঞ্জদেও?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। আপনি কী করে বুঝলেন? কাকাবাবু হেসে বললেন, আমার শার্লক হোমসের মতন ক্ষমতা নেই। তবে আপনার গলায় একটা সোনার হার রয়েছে, কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেওর গলাতেও ঠিক এইরকম হার দেখেছি। আপনাদের পরিবারের লোকদের বোধহয় এরকম হার পরা নিয়ম, তাই না?

রুদ্রকুমার বলল, ঠিক ধরেছেন। একুশ বছর বয়স হলেই এই হার পরতে হয়। এখানকার মন্দিরের হেড পুরুতমশাই পরিয়ে দেন। আপনারা তো কাল রাত্তিরে এসেছেন, পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

কাকাবাবু বলল, না, সেরকম কিছু না। রুদ্রকুমার বলল, দাদা বলেছিলেন, আপনারা আসবেন, কাছাকাছি জায়গাগুলো ঘুরে দেখবেন, তাই জিপটা নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম। ড্রাইভার আছে, যেখানে যেতে চাইবেন, নিয়ে যাবে।

এবার বিনয়ভূষণ বললেন, ছোটবাবু, সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেছে, শুনেছেন?

রুদ্রকুমার দারুণ অবাক হয়ে বলল, অ্যাঁ সিন্দুকটা... যেটা পুকুরের মধ্যে ছিল? কবে তোলা হল?

বিনয়ভূষণ বললেন, কালই তুলতে পারা গিয়েছিল!

রুদ্রকুমার খুবই বিরক্তভাবে বলল, একরাতেই চুরি হয়ে গেল! থানা থেকে? আপনারা আছেন কী করতে? যত সব অপদার্থ!

বিনয়ভূষণ বললেন, আজ্ঞে, থানা থেকে চুরি হয়নি। এ-বাড়িতেই রাখা হয়েছিল।

কেন?

মন্দিরের পুরুতরা বলল, এ-বাড়িতেই, সবার সামনে তালা ভেঙে দেখা হবে।

রুদ্রকুমার বলল, এ-বাড়িতে রাখার কোনও মানে হয়? কে পাহারা দেবে? এই নটবর সিংহ? আপনারা পুলিশ পোস্টিং করেননি কেন?

বিনয়ভূষণ খানিকটা চুপসে গিয়ে বললেন, সেরকম কেউ বলেনি। মানে, আমাদের উপর কোনও অর্ডার ছিল না।

রুদ্রকুমার বলল, অতবড় সিন্দুকটা নিল কী করে? চোরেরা কি লরিটরি এনেছিল?

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে বলল, এই যে মাটিতে দাগ, ঘষটাতে ঘষটাতে নিয়ে গেছে। মিস্টার রায়চৌধুরী, দেখুন, দেখুন।

কাকাবাবু কোনওরকম আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়।

রুদ্রকুমার আর-একটু এগিয়ে বলল, এই যে ভিতর থেকে নিয়ে এসেছে, সিমেন্টের উপরেও দাগ, তারপর বাড়ির বাইরে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে!

তারপর রুদ্রকুমার কাকাবাবুর কাছে ফিরে এসে বলল, ইস, ছি ছি ছি, সিন্দুকটার মধ্যে কী ছিল, তা জানাই গেল না! হয়তো খুব দরকারি কোনও দলিলপত্র ছিল! এ তো চুরি নয়, ডাকাতি!

কাকাবাবু বললেন, সিন্দুকটার মধ্যে অনেক কিছুই থাকতে পারে। ডাকাতরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ তালা ভেঙে ফেলেছে। এখন সেই ডাকাতদের ধরা পুলিশের কাজ।

বিনয়ভূষণের দিকে ফিরে কাকাবাবু বললেন, আমি এখন ভিতরে যাচ্ছি। আমাদের কালকের ড্রাইভার গুরুপদর কোনও খোঁজ পেলে আমাকে জানাবেন।

ঠিক নটার সময় সবাই মিলে ব্রেকফাস্ট খেতে যেতে হল।

টেবিলের উপর প্লেট নেই, তার বদলে টুকরো টুকরো কলাপাতা। তার উপর পাকা কলা, সবেদা, আম আর পাকা পেঁপে। আর রয়েছে নানারকমের মিষ্টি।

কমলিকা খাবার তুলে দিতে দিতে কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, এরপর চা না কফি?

কাকাবাবু বললেন, কফি। সকালে উঠে প্রথমবার চা খাই। তারপর সারাদিন কফি।

কমলিকা জোজোকে জিজ্ঞেস করল, এই সন্তু, তুমি চা খাও নাকি?

জোজো বলল, খাব না কেন? আমিও খাই, জোজোও খাও।

কমলিকা বলল, আমি চা খাই না। দাদাও খায় না। বাজে অভ্যেস।

প্রবীর বলল, আমি অবশ্য আমাদের কলেজের সামনে কফি হাউজে গিয়ে মাঝে মাঝে কফি খাই। বন্ধুরা জোর করে।

এই সময় জগোদাদা একটা হুইল চেয়ার ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল, তাতে বসে আছেন কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেও। তার কোলের উপর একটা চাদর পাতা। মুখোনা একেবারে শুকনো। মনে হয় খুবই অসুস্থ।

তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

কিরণচন্দ্র আস্তে আস্তে বললেন, বসুন, সবাই বসুন। রায়চৌধুরীদাদা, রাত্রে ঠিক ঘুম হয়েছিল তো?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু আপনার এই অবস্থা হল কবে? আর হাঁটতেই পারেন না?

কিরণচন্দ্র বললেন, না, পায়ে একেবারে জোর নেই। সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু বললেন, ইস! আপনি তো আমার চেয়ে বয়সে বেশ ছোট?

কিরণচন্দ্র বললেন, আমার যে মনের জোরটাও কমে গেছে! থাক সেসব কথা। আপনারা বেড়াতে এলেন, এর মধ্যে কী ঝঞ্ঝাট শুরু হল বলুন তো! একটা সিন্দুক নাকি চুরি হয়েছে, তার ফলে যখন-তখন পুলিশ আসছে। পুলিশদের তো আর নিষেধ করা যায় না। ও সিন্দুকটা আমাদের বাড়িতে রাখারই বা কী দরকার ছিল?

কাকাবাবু বললেন, অনেকের ধারণা হয়েছে, ওই সিন্দুকটার খবর পেয়েই আমি আপনার কাছে এসেছি!

কিরণচন্দ্র একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল তো একমাস আগে। আপনাকে ওসব সিন্দুক ফিন্দুক নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। ভাইপোদের নিয়ে এসেছেন, একটু চারদিক বেড়িয়ে টেড়িয়ে দেখুন। বেড়াবার অনেক জায়গা আছে।

তারপর তিনি প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ছোটকাকা ফিরেছে শুনলাম। সে কোথায়? ব্রেকফাস্ট খেতে এল না?

প্রবীর বলল, ছোটকাকা একটু আগে ফিরেছে। তারপরই ঘুমিয়ে পড়ল?

কিরণচন্দ্র বললেন, এখন ঘুমোচ্ছে? সে কী!

কমলিকা বলল, ছোটকাকা মাঝে মাঝেই সকালবেলা ঘুমোয়, আর রাত্তিরবেলা জেগে থাকে।

কিরণচন্দ্র বললেন, সে কী!

কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গে দেখা করেছে আমার ছোটভাই? ও কিন্তু কলকাতায় যেতে চায় না, এই ভাঙা বাড়িতে থাকাই পছন্দ করে।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। রুদ্রকুমারের সঙ্গে আমার দু-একটা কথা হয়েছে।

কিরণচন্দ্র বললেন, আপনি যে ইতিহাস নিয়ে চর্চা করছিলেন, তার কতটা এগোল?

কাকাবাবু বললেন, কিছু কিছু সূত্র পেয়েছি। আপনাদের এই জায়গাটারও তো অনেক ইতিহাস আছে।

কিরণচন্দ্র বললেন, তা তো আছেই। তবে অনেক কিছুই লিখে রাখা হয়নি, হারিয়ে যাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, আপনি একটা হিসেবের খাতার কথা আমাকে বলেছিলেন।

কিরণচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ। কিছুদিন আগে আমি কয়েকখানা হিসেবের খাতা খুঁজে পেয়েছি। খুব পুরনো। তাতে লেখা আছে আমাদের রাজবাড়ির প্রতিদিনের হিসেব। অনেক লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে, আতশ কাচ, দিয়ে কষ্ট করে পড়া যায়।

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল।

সন্তু বলল, আতশ কাচ হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্রাস।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সেইসব হিসেব কি ওড়িয়া ভাষায় লেখা?

কিরণচন্দ্র বললেন, প্রথম চারখানা খাতা বাংলায় লেখা। তখন এখানে বাংলা ভাষা চালু ছিল। পরেরগুলো ওড়িয়া ভাষায়। মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা। তাতে অনেক মজার মজার খবর পাওয়া যায়। যেমন হাতির বিয়েতে কত খরচ হয়েছিল। বাঘ মারার জন্য একজন সাহেব শিকারিকে ডেকে আনা হয়েছিল, তার জন্য খরচ। সে শিকারির সঙ্গে এসেছিল একজন মেমসাহেব। এই অঞ্চলের মানুষ তার আগে কোনও মেমসাহেব দেখেনি। সেই মেমসাহেব ডাবের জল ছাড়া অন্য জল খেতই না! তার জন্য শত শত ডাব আনানো হয়েছিল বাংলা মুল্লুক থেকে। এখানে তো ডাব পাওয়া যায় না! কয়েকটা যুদ্ধের কথাও আছে। কিছু কিছু ব্যাপার অবশ্য বুঝতেও পারিনি।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, প্রথম খাতাটা কত পুরনো?

কিরণচন্দ্র বললেন, তারিখ লেখা আছে, প্রথমটা শুরু হচ্ছে এইট্টিন ফিটি ওয়ান থেকে। প্রথম বছরেই আছে হাতির বিয়ের কথা। রাজার নিজস্ব একটা হাতি ছিল, আর রানিরও ছিল এক হস্তিনী। খুব ধুমধাম করে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুজনের, তখনকার দিনে খরচ হয়েছিল সাত হাজার টাকা। এখনকার দিনে সাত লাখ টাকার সমান।

প্রবীর বলল, বাবা, আমি খাতাগুলো পড়তে চাই। ওর থেকে গল্প লিখব।

কমলিকা বলল, আমিও পড়ব।

কাকাবাবু বললেন, তোমরা তো পড়বেই। তোমাদের বাড়ির জিনিস। আগে আমি একবার পড়ে নিতে পারি কি?

কিরণচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, রায়চৌধুরীদাই আগে পড়বেন। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে আমার আতশ কাচটাও দিয়ে দেব। আমি এবার যাই? কিছুক্ষণ কথা বললেই ক্লান্ত লাগে।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি বিশ্রাম নিন। আমাদেরও তো খাওয়া শেষ হয়ে গেছে!

৪. মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা

মোট সাতখানা মোটা মোটা খাতা। লম্বাটে ধরনের, লাল কাপড় দিয়ে বাঁধানো।

কাকাবাবু খাতাগুলো দেখতে দেখতে বললেন, আগেকার দিনে এই ধরনের খাতাকে বলা হত খেরোর খাতা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কেন, ওরকম নাম ছিল কেন? খেরো মানে কি হিসেব?

কাকাবাবু বললেন, না। এই লাল রঙের মোটা কাপড়কে বলে খেরো। এই কাপড় দিয়ে বাঁধালে খাতাগুলো মজবুত হয়। দেড়শো বছরের বেশি টিকে আছে।

নিজে একটা খাতার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, জোজো আর সন্তু, তোরাও দেখ তো, এইটিন ফিটি সেভেন আর ফিটি এইটের হিসেব কোন খাতায় আছে?

জোজো একটা খাতা নিয়ে বলল, এ তো ওড়িয়া ভাষা, পড়ব কী?

কাকাবাবু বললেন, ওগুলো বাদ দাও। প্রথম দিকেরগুলোই আমাদের দরকার।

সন্তু বলল, আমার কাছে এই খাতাটায় আঠারোশো চুয়ান্ন সাল থেকে শুরু হয়েছে... আর শেষ হয়েছে আঠারোশো উনষাটের জুন মাসে। কাকাবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, ওই খাতাটাই আমার দরকার।

অনেক লেখার কালি এমনই অস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও পড়া যায় না। কোনও কোনও পাতা পোকায় খেয়েছে। তবু কাকাবাবু

কষ্ট করে পড়তে লাগলেন।

অধিকাংশই জিনিসপত্র কেনার হিসেব। নতুন পালকি ক্রয়, ঠাকুরের গয়না, বাবুদের ইংলিশ জুতো, চাল, ডাল, তিনজোড়া বন্দুক, আঠাশখানা তরবারি। একদিনের হিসেবে লেখা আছে, সাপের বিষে রাজকুমারের মৃত্যু ও পুনর্জীবন লাভ। ওঝা মহাশয়কে পুরস্কার একান্ন টাকা ও শাল।

কাকাবাবু পড়া থামিয়ে বললেন, এটা কী ব্যাপার বুঝতে পারলি? অনেক সাপেরই বিষ থাকে না। সেই সাপ কামড়ালেও মানুষ বেঁচে যায়। অনেকেই তো প্রথমে বুঝতে পারে না, সাপটার বিষ আছে কি না! তখন ওঝাকে ডাকে। ওঝা এসে লাফালাফি করে, মন্ত্রট পড়ে, তারপর সেই লোকটি বেঁচে উঠলেই ওঝার কৃতিত্ব হয়। রাজকুমারকেও নিশ্চয়ই সেরকম একটা ঢেঁড়া সাপ কামড়েছিল।

সন্তু বলল, আর যখন সত্যিই বিষাক্ত সাপে কামড়ায়, তখন তো বাঁচানো যায় না। সেইসময় ওঝা কী বলে?

কাকাবাবু বললেন, তখন ওঝামশাই কপাল চাপড়ে বলেন, অনেক চেষ্টা তো করলাম। কিন্তু নিয়তি তো খণ্ডানো যায় না, ওর এইসময় মৃত্যুযোগ ছিল। আয়ু ফুরিয়ে গেছে।

খাওয়ার টেবিলে জোজো কোনও কথা বলতে পারেনি। বেশিক্ষণ চুপ করে থাকলে ওর পেট ফুলে যায়।

সে এবার গম্ভীরভাবে বলল, খুব বিষাক্ত সাপে কামড়ালেও মানুষকে বাঁচানো যায়। একবার গারফিল্ড সোবার্সকে সাপে কামড়েছিল। সুন্দরবনে।

সন্তু বলল, সোবার্স সুন্দরবনে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিলেন বুঝি?

জোজো বলল, না, কলকাতায় টেস্ট খেলতে এসেছিলেন, তারপর বেড়াতে গেলেন সুন্দরবনে। সেখানে কালকেউটে সাপে কামড়েছিল। বাঁ পায়ে।

সন্তু বলল, সোবার্স খেলা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের জন্মের আগে। তুই দেখলি কী করে?

জোজো বলল, আমি দেখেছি তো বলিনি। শুনেছি। আমার মামার কাছে। মামার সঙ্গেই তো সোবার্স বেড়াতে গিয়েছিলেন।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, বাধা দিচ্ছিস কেন? জোজোকে গল্পটা বলতে দে না!

জোজো বলল, এটা গল্প নয়। ফ্যাক্ট! কালকেউটে সাপে কামড়ালে ঠিক ছঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। মহা মুশকিল। কাছাকাছি কোনও ডাক্তার নেই, আমার বাবাকেও ডেকে নিয়ে যাবার সময় নেই। তা ছাড়া, আমার বাবা তখন ছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়।

সন্তু বলল, হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়া থেকে ডেকে আনা খুব মুশকিল তো বটেই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর? সোবার্স তো এখনও বেঁচে আছেন। কী করে বাঁচলেন?

জোজো বলল, সোবার্সকে সাপে কামড়েছিল নদীর ঘাটে। সেখানে বিরাট ভিড় জমে গেল। অনেকরকম লোক। ছোট, বড়, মাঝারি। ইয়ে, কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। আমার মামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কারও নাম নীলকণ্ঠ? কিংবা নীলকণ্ঠ নামের কাউকে চেনো? সেখানে নীলকণ্ঠ নামের কেউ নেই, কিন্তু পাশের গ্রামের একজন নৌকোর মাঝি আছে ওই নামে। মামা বললেন, শিগগির সেই মাঝিকে তোমরা কেউ ডেকে আনো। আসতে না চাইলে জোর করে ধরে আনবে!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সোবার্স সাহেবের তখন কী অবস্থা? তিনি কথা বলতে পারছেন?

জোজো বলল, না, না, তিমি ঘুমিয়ে পড়ছেন, আর আমার মামা তার গালে চড় মেরে মেরে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে গেল নীলকণ্ঠ মাঝি। মামা তাকে বললেন, একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পারো এই বিখ্যাত মানুষটাকে, না হলে আমাদের দেশের খুব বদনাম হয়ে যাবে! লোকটি বলল, আমি তো ওঝা নই। মন্তরও জানি না।

মামা বললেন, মন্তরটন্তরের দরকার নেই। বাটি থেকে চুমুক দিয়ে যেমন লোকে দুধ খায়, তুমিও সেইরকম সাপে কামড়ানো জায়গাটায় চুমুক দিয়ে বিষ টেনে আনে। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও বিপদ হবে না। সেই মাঝি সোবার্সের ডান পায়ে সেই জায়গায় মুখ লাগিয়ে দুবার চুমুকের মতন টানল। ব্যস, সোবার্স অমনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বললেন, একী, এত ভিড় কেন? আমাকে কি বাঘে অ্যাটাক করেছিল?

কাকাবাবু বললেন, এটা দারুণ গল্প। মানে ফ্যাক্ট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুখ দিয়ে যারা বিষ টানতে যায়, তারা নিজেরাই মরে যায়। মুখের মধ্যে কোথাও যদি একটু ঘা থাকে, কিংবা গালে কোনও কাটাটাটা থাকে, তা হলেই সেই বিষ রক্তে মিশে গিয়ে দুজনেরই মৃত্যু হবে। কিন্তু যার নাম নীলকণ্ঠ, তার কোনও ভয় নেই, সে তো সব বিষ হজম করে ফেলতে পারে।

সন্তু বলল, সোবার্সের বাঁ পায়ে সাপ কামড়েছিল, লোকটি মুখ লাগাল ডান পায়ে। তাতেই কাজ হয়ে গেল!

জোজো সেকথা গ্রাহ্য না করে বলল, আর-একবার থাইল্যান্ডের রানিকে। সাপে কামড়েছিল...।

কাকাবাবু বললেন, থাক, আর সাপের গল্প নয়। অনেক পাতা পড়তে হবে!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, এক মিনিট! হারে জোজো, তুই যে কাল বলছিলি, দিল্লির এয়ারপোর্টে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গাঁধীকে দেখে তোর বাবা কী যেন বললেন, তারপর কী হল রে?

জোজো বলল, বাকিটা বলিনি বুঝি? কতটা বলেছিলুম রে।

সন্তু বলল, তোর বাবা, এই রাজীব, শোনো, শোনো বলে ডাকলেন, তাই শুনে রাজীব গাঁধী কাছে এসে প্রণাম করলেন তোর বাবার পায়ে হাত দিয়ে...

জোজো বলল, হ্যাঁ, বাবা রাজীব গাঁধীর কপালের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলেন। উনি তখন সাউথ ইন্ডিয়ায় যাচ্ছিলেন। বাবা বললেন, রাজীব, তোমার পক্ষে এই সময়টা ভাল নয়, এখন সাউথ ইন্ডিয়ায় যেয়ো না, বাড়ি ফিরে যাও, তিনদিন বাড়ি থেকে বেরোবে না, অচেনা কারও সঙ্গে কথাও বলবে না। তা হলেই ফাঁড়া কেটে যাবে। রাজীব গাঁধী বললেন, তার তো উপায় নেই, ইলেকশন মিটিং আছে, এখন আর ক্যানসেল করা যাবে না। বাবার কথা না শুনে প্লেনে উঠে গেলেন, তারপর কী হল, তা সবাই জানে। বোমার ঘায়ে টুকরো টুকরো।

সন্তু বলল, তোর বাবার কথা শুনে চললে রাজীব গাঁধী বেঁচে থাকতেন আজও, আবার হতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী।

কাকাবাবু আবার পড়া শুরু করেছেন। থেমে গেলেন এক জায়গায়। ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটা মুছে ভাল করে পড়ার চেষ্টা করলেন দু-তিনবার।

তারপর জোজোকে বললেন, দ্যাখো তো কী লেখা আছে, ঠিক পড়া যাচ্ছে না।

জোজো বলল, লেখা আছে ধূধূ পথ। খাওয়া বাবদ খরচ সাত টাকা। ধুধু পথ দিয়ে কেউ খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল?

কাকাবাবু বললেন, এবার সন্তু পড়ে দ্যাখ তো!

সন্তু আতশ কাচ চোখে দিয়ে বলল, হ্যাঁ, ধুধু পথই লেখা আছে। তবে বানান ভুল করেছে। উপরে দুটো চন্দ্রবিন্দু আছে। ধুধু পথ।

কাকাবাবু বললেন, ধুধু পথ না হয়ে ওটা যদি কারও নাম হয়? খানিকটা ভুল করেছে।

সন্তু বলল, ধুধু পথ কারও নাম হতে পারে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, ধুন্ধু পন্থ হতে পারে না? নানাসাহেবের নাম ধুন্ধুপন্থ। তারিখটাও মিলে গেছে, একুশে জুন, এইট্টিন ফিফটি এইট!

সন্তু বলল, তা হলে সত্যিই নানাসাহেব এখানে এসেছিলেন?

কাকাবাবু বললেন, হতেও পারে। এখানেও পুরোপুরি জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে এ-পর্যন্ত জানা গেছে, ইংরেজদের কাছে যাতে ধরা দিতে

হয়, সেজন্য নানাসাহেব প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিলেন নেপালে। কিন্তু নেপালের রাজা তাকে আশ্রয় দিতে চাননি। ইংরেজদের ভয়ে তাকে নেপাল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। এরপর নানাসাহেব গোপনে গোপনে ঘুরলেন বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে। কোনও রাজাই তাকে রাখতে রাজি হলেন না। সকলেরই ভয়, নানাসাহেবকে ধরার জন্য ইংরেজরা খবর পেলেই তাদের রাজ্য আক্রমণ করবে। সিপাহি বিদ্রোহের পর বড় ভয়ংকর, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ইংরেজরা। তারপর তিনি খুব সম্ভবত জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে পড়েছিলেন এই ময়ূরভঞ্জে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, উনি একা ছিলেন?

কাকাবাবু বললেন, না, না উনিও তো একজন রাজা। বারোজন খুব বিশ্বাসী সহচর নিয়ে ঘুরছিলেন। আর কানপুর ছেড়ে পালাবার আগে বেশ কিছু ধনরত্নও সঙ্গে নিয়েছিলেন।

জোজো বলল, বারোজন লোক? এখানে যে খাওয়ার খরচ লেখা আছে। মোট সাত টাকা? কী খেয়েছিল?

কাকাবাবু হেসে বললেন, তখনকার দিনে সাত টাকা মোটেই কম নয়। অনেক কিছু কেনা যেত। অনেক লোকের এক মাসের মাইনেই হত দশ-বারো টাকা। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাবা চাকরি করে পেতেন দশ টাকা। এই হিসেবে দেখছি, পরপর তিনদিন ওদের খাওয়ার খরচ লেখা আছে। তারপর নেই।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তার মানে কী, তিনদিন পর ওঁরা চলে গেলেন?

কাকাবাবু বললেন, তা না-ও হতে পারে। প্রথম তিনদিন ছিলেন রাজার অতিথি। তারপর হয়তো আলাদা কোনও বাড়িতে ছিলেন, নিজেরাই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

জোজো বলল, না-ও হতে পারে। এ-রাজ্যের রাজাও ধুন্ধুমারকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সন্তু বলল, ধুন্ধুমার নয়, ধুন্ধুপন্থ।

কাকাবাবু বললেন, সেটাও অসম্ভব নয়। আরও খোঁজ করতে হবে। শুধু এইটুকু অন্তত জানা গেল, এ-রাজ্যের রাজা পুরো দলটিকে তিনদিন খাইয়েছিলেন।

এইসময় দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কমলিকা।

সে বলল, এই, তোমরা বেড়াতে যাবে না? সবসময় ঘরে বসে থাকবে?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, চলো, একবার মন্দিরটা দেখে আসি। আমরা। তো তৈরিই আছি।

কমলিকা বলল, মন্দির দেখব, তারপর তোমাদের দিব্যগড়ে নিয়ে যাব।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সেখানে কী আছে?

কমলিকা বলল, একটা বেশ ভাঙা দুর্গ, তার ভিতরে একটা পুকুর, সেখানে এখনো পদ্মফুল ফোটে।

সবাই মিলে চেপে বসা হল জিপটায়।

এর ড্রাইভারের নাম গৌরাঙ্গ, বয়স বেশ কম, প্যান্ট-শার্ট পরা। নাম গৌরাঙ্গ হলেও তার গায়ের রং কিন্তু ফরসা নয়।

বাড়ির গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে দুজন বন্দুকধারী পুলিশ। বন্দুক দুটো দেখেই বোঝা যায়, বহুকাল এ-বন্দুকে গুলি চালানো হয়নি। নলে মরচে ধরে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, একেই বলে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে! কাল রাতে কেউ পাহারা দেয়নি, এখন সিন্দুকটা চুরি যাওয়ার পর পুলিশ বসেছে। এখন কী পাহারা দেবে?

প্রবীর বলল, যারা চুরি করেছে, তারা এতক্ষণে তালাটালা ভেঙে ভিতরের সবকিছু নিয়ে নিয়েছে।

কিচকেশ্বরী মন্দিরটা খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া গেল। সেখানে বেশ ভিড়, বাইরে থেকে অনেক টুরিস্ট এই মন্দির দেখতে আসে। কয়েকখানা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে।

মূল মন্দিরটার চারপাশে আরও অনেক ছোট ছোট মন্দির। সেখানেও ঘুরছে অনেক লোক। কয়েকটা দোকান রয়েছে পাথরের জিনিসপত্রের।

কাকাবাবু বললেন, আমি ওই ভিড়ের মধ্যে যাব না। আমার অত মন্দির দেখার সাধ নেই। তোমরা দেখে এসো। পুকুরটা কোথায়? যেটা খোঁড়া হচ্ছে।

প্রবীর বলল, সেটা আছে ওপাশে। একটু হেঁটে যেতে হবে।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি মানুষের মাথার খুলিগুলো দেখবেন?

কাকাবাবু বললেন, সেগুলোই বা দেখে কী করব? সব মানুষের মাথার খুলিই তো একরকম।

জোজো বলল, কী আশ্চর্য, জ্যান্ত মানুষ কত আলাদা রকমের হয়, কিন্তু মড়ার খুলিগুলো কেন একরকম?

কাকাবাবু বললেন, তার কারণ, সব মানুষই আসলে একইরকম। একই জাতি। শুধু চামড়া আর গায়ের রঙের জন্য আলাদা মনে হয়। একজন সাদা সাহেবের মাথার খুলি আর একজন কালো মানুষের মাথার খুলিতে কোনও তফাত নেই!

প্রবীর বলল, ছেলে আর মেয়েদের মাথার খুলিতেও কোনও তফাত নেই। শুধু একটু ছোট-বড় হতে পারে। সে তো ছেলেদের চেহারাও ছোট- বড় হয়।

কাকাবাবু বললেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ছেলে মেয়েদের আলাদা করে চিনতে পারা যায়, কিন্তু কালো লোক, সাদা লোকের তফাত বোঝার কোনও উপায় নেই।

কমলিকা বলল, অ্যাডাম আর ইভের থেকেই তো মানুষ জাতটার জন্ম, ওরা তো ফরসা ছিল। তা হলে এত কালো মানুষ এল কী করে?

সন্তু বলল, কে বলল, অ্যাডাম-ইভ ফরসা ছিল?

কমলিকা বলল, বাঃ, কত ছবিতে দেখেছি!

সন্তু বলল, সেগুলো কি ক্যামেরায় তোলা ছবি, না আঁকা ছবি?

কমলিকা বলল, বাঃ, তখন বুঝি ক্যামেরা ছিল?

সন্তু বলল, আঁকা ছবি তো ইচ্ছেমতন রং দিয়ে আঁকা যায়। বাইবেলের ছবি সাহেবরা এঁকেছে, তাই সবাইকে ফরসা করে দিয়েছে।

প্রবীর বলল, ঠিক বলেছ, যিশুখ্রিস্টও সাহেবদের মতন ফরসা ছিলেন না। উনি তো মিল ইস্টের লোক।

সন্তু বলল, অ্যাডাম-ইভের কাহিনি তো গল্প। আমি ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছি, সায়েন্টিস্টরা বলেছেন, পৃথিবীর প্রথম মেয়েটি জন্মেছিল আফ্রিকায়। তার গায়ের রং কুচকুচে কালো। সে-ই আমাদের সকলের মা। তার নাম দেওয়া হয়েছে আফ্রিকান ইভ!

কাকাবাবু এদের আলোচনা শুনে বেশ মজা পাচ্ছিলেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানে। কত সহজে স্পষ্ট কথা বলে।

এবার তিনি সন্তুকে বললেন, যা, তাড়াতাড়ি মন্দির টন্দির দেখে আয়। আমি বসছি।

ওরা নেমে যাবার পর কাকাবাবু ড্রাইভার গৌরাঙ্গকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও দেখতে যাবে নাকি? যেতে পারো।

গৌরাঙ্গ বলল, না স্যার, আমি কতবার দেখেছি। রাজবাড়িতে কোনও অতিথি এলে তো আমাকেই দেখাতে আনতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, তা তো ঠিকই। আচ্ছা, তুমি গুরুপদ রায়কে চেনে?

গৌরাঙ্গ বলল, কোন গুরুপদ? মুখপোড়া গুরুপদ? মোটর গ্যারাজে কাজ করে?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। গাড়িও চালায়। ওর মুখোনা ওইভাবে পুড়ল কী করে?

গৌরাঙ্গ বলল, তা কে জানে! ও মাঝে মাঝে কোথায় যেন চলে যায়, দুমাস-তিন মাস ফেরে না। একবার ফিরল, ওইরকম কালো পোড়া-মুখ নিয়ে। কেউ জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে অ্যাকসিডেন্ট। আর কিছু না। একবার ও এক জায়গায় ডাকাতির দায়ে ধরা পড়েছিল। হয়তো নিজে ডাকাতি করেনি, দলের লোকদের চিনত। সেবার তো আমাদের বাবুই ওকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তোমাদের কোন বাবু? কিরণচন্দ্র...

আজ্ঞে না। তিনি তো এখানে প্রায় থাকেনই না। ছোটবাবু। উনি অনেক মানুষের উপকার করেন।

আচ্ছা, তোমাদের এই ছোটবাবু কি যাত্রা-থিয়েটার করেন?

গৌরাঙ্গ চমকে উঠে বলল, আপনি স্যার কী করে জানলেন? হঠাৎ কেন জিজ্ঞেস করলেন?

কাকাবাবু বললেন, এমনিই। কেন যেন মনে হল।

গৌরাঙ্গ বলল, হ্যাঁ, স্যার, এখানে মাঝে মাঝেই থিয়েটার হয়। ছোটবাবুকে ছাড়া চলেই না। রাজা-মহারাজার পার্টে ওঁকে খুব ভাল মানায়।

কাকাবাবু বললেন, তা তো মানাবেই। এখন রাজত্ব নেই বটে, তবু তো রাজবংশের সন্তান।

গল্প করতে করতে খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর ফিরে এল সন্তুরা।

কমলিকা বলল, মাথার খুলিগুলো ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলেছে। দেখলে আর ভূত-ভূত মনে হয় না।

সন্তু বলল, কপালে আবার চন্দনের ফোটা পরিয়ে দিয়েছে।

জোজো বলল, আমি একজন পুরুতঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলুম, আগে কি এই মন্দিরে হিউম্যান স্যাক্রিফাইস, মানে নরবলি হত? তিনি খুব জোরে জোরে মাথা নেড়ে বললেন, না, না, না! আসলে নরবলি হত।

কমলিকা বলল, তুমি কী করে জানলে?

জোজো বলল, পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, একটা খুলি আমায় ফিসফিস করে বলল, আমাদের বলি দিয়েছে। মুন্ডু কেটে জলে ফেলে দিয়েছে!

কমলিকা বলল, ওঃ, সন্তুটা কী গুল মারে!

সন্তু বলল, সত্যি, সন্তুকে নিয়ে আর পারা যায় না। আমাকে নকল করতে চায়, কিন্তু জানে না কিছুই!

প্রবীর বলল, চলুন, তা হলে পুকুরটার কাছে যাওয়া যাক।

কাকাবাবু জিপ থেকে নেমে পড়লেন। মন্দিরগুলোর পিছন দিক দিয়ে খানিকটা হাঁটতে হল।

পুকুরটা বেশ বড়। বাঁধানো ঘাট আছে, কিন্তু জল প্রায় নেই। মাঝখানে থিকথিকে কাদা। কিছু লোক আজ মাটি খোঁড়ার কাজ করছে।

কমলিকা বলল, ওই যে দেখছেন এক জায়গায় একটা বাঁশ পোতা, ওইখানে সিন্দুকটা পাওয়া গেছে। সেই সিন্দুকের মধ্যে সাতটা মানুষের মুন্ডু!

প্রবীর বলল, আবার তুই উলটোপালটা বকছিস? সিন্দুকটা তো খোলাই যায়নি। মুন্ডুগুলো ভিতরে থাকবে কী করে?

কমলিকা বলল, সরি, সরি!

কাকাবাবু ঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, সন্তু, দ্যাখ তো, এখানে একটা পাথরের ফলকে কী লেখা আছে? উপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

সন্তু একটা রুমাল ঘষে ঘষে শ্যাওলা খানিকটা তুলে ফেলল। পাশে দাঁড়িয়ে জোজো বলল, কী সব লেখা আছে হিন্দিতে।

সন্তু বলল, হিন্দি না, সংস্কৃত। অনেক অনুস্বর বিসর্গ আছে। সব পড়া যাচ্ছে না। মাতৃ... উৎসর্গ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কোনও তারিখ লেখা আছে?

সন্তু বলল, হ্যাঁ, সন বারোশো দশ।

কাকাবাবু বললেন, তার মানে কেউ তার মায়ের নামে এই পুকুরটা উৎসর্গ করেছিল। আগেকার দিনে লোকে মনে করত, পুকুর কাটালে পুণ্য হয়। ঠিকই মনে করত। কত লোক ব্যবহার করতে পারত সেই পুকুর। এটা বেশ পুরনো।

কমলিকা বলো তো, এটা বাংলা কত সন?

কমলিকা জানে না। প্রবীর, জোজোও বলতে পারল না। সন্তু একটু চিন্তা করে বলল, চোদ্দোশো এগারো।

কাকাবাবু বললেন, তার মানে পুকুরটার বয়স কত?

কমলিকা বলল, নাইনটি নাইন।

কাকাবাবু বললেন, তুমি দেখছি অঙ্কে খুব ভাল। চট করে বলে দিলে।

সন্তু আর জোজো হাসছে দেখে কমলিকা বলল, ভুল হয়েছে, তাই না? আসলে তো আমি ভাল ছবি আঁকতে পারি, তাই অঙ্ক জানি না।

জোজো বলল, আমি তো ইংরেজিতে ফার্স্ট হই, তাই আমি সাঁতার জানি না।

সন্তু বলল, আমি তো শিঙাড়া খেতে ভালবাসি, তাই আমাকে মশা কামড়ায়।

কমলিকা বলল, এই, আমার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে! এমন মজা দেখাব!

প্রবীর বলল, তোমরা আমার বোনকে আর রাগিয়ো না, তা হলেই ভা করে কেঁদে ফেলবে!

কমলিকা বলল, মোটেই আমি ভা করে কাঁদি না। আমি উউ করে কাদি।

কাকাবাবু হাসছিলেন ওদের কথা শুনে। এবার বললেন, ওই পাশের বাড়িটা কী বলো তো? ওখানেও ভিড় দেখছি।

প্রবীর বলল, ওটা একটা খুব পুরনো ভাঙা বাড়ি। কেউ থাকে না। আমার জন্ম থেকেই এরকম দেখছি। লোকে বলে ভূতের বাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, ওই লোকগুলো কি ভিড় করে ভূত দেখতে যাচ্ছে। নাকি? এই দিনেরবেলা!

প্রবীর বলল, ওই বাড়িটায় একটা সুড়ঙ্গ আছে। ভিতরে গেলে গা ছমছম করে। বাচ্চা বয়সে আমরা ওর মধ্যে খেলতে যেতাম। তবে বেশি দূর যাওয়া যায় না।

কাকাবাবু বললেন, আগেকার দিনে অনেক জমিদার বাড়িতে কিংবা রাজবাড়িতে এরকম সুড়ঙ্গ থাকত। শত্রুসৈন্য কিংবা ডাকাতের দল আক্রমণ করলে ওখানে লুকিয়ে থাকা যেত কিংবা পালিয়েও যাওয়া যেত অন্য দিক দিয়ে।

কথা বলতে বলতে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন সেই বাড়িটার দিকে।

সেখানে একজন লোক মোম বিক্রি করছে। অনেক লোক কিনছে একটা করে লাল রঙের মোম। যে-লোকটি বিক্রি করছে তার পিছনে একটা চৌকো টিনের সাইন বোর্ড। তাতে ইংরেজিতে লেখা, আব্দুল লতিফস ফেমাস ক্যান্ডেল শপ। ইচ রুপিজ ফাইভ। লোকটির চেহারা বেশ সুন্দর, সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা।

কাকাবাবুদের দেখে লোকটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, আসুন স্যার। মোম নিন। সুড়ঙ্গ দেখে আসুন। ভেরি থ্রিলিং! ভেরি ডার্ক। হয়তো ভূতেরও দেখা পেতে পারেন!

কাকুবাবু সন্তুদের জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, দেখতে যাবি নাকি?

সন্তু বলল, নাঃ! অনেক সুড়ঙ্গ দেখেছি! আর দিনেরবেলা ভূত দেখার কোনও মজা নেই!

কাকাবাবু আব্দুলকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই সুড়ঙ্গে কি শুধু ভূতই আছে? পেতনি নেই, শাকচুন্নি নেই?

আব্দুল বলল, মেয়ে-ভূতের কথা বলছেন তো? তাও আছে গোটাচারেক!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজে ওর ভিতরে গেছ? তুমি ভূত দেখেছ কখনও?

আব্দুল এদিক-ওদিক চাকিয়ে নিচু গলায় বলল, আপনি তো ভালই জানেন স্যার, ভূত বলে কিছু নেই। ওসব গাঁজাখুরি গল্প। আমি বেকার, চাকরি-বাকরি পাইনি, তাই মোম বিক্রি করে চালাচ্ছি! ভূতটুতের কথা বললে, বিক্রি ভাল হয়।

কাকাবাবু বললেন, তা তো ভালই।

প্রবীর বলল, আব্দুলদা থিয়েটারে খুব ভাল পার্ট করেন। আমার ছোটকাকার থিয়েটারের দল আছে। আগেরবার এসে আমি একটা থিয়েটার দেখেছিলাম, কী যেন নামটা... হ্যাঁ, রাজা চলি গিলা বনবাস। তাতে আব্দুলদা সেনাপতি কীর্তি সিংহর পার্ট করেছিল। তাই না আব্দুলদা?

আব্দুল কাকাবাবুকে বলল, সামনের শনিবার আবার প্লে আছে। রায়চৌধুরীবাবু, আপনি থাকবেন তো? দেখে যান না?

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, তুমি আমার নাম জানলে কী করে?

আব্দুল বলল, স্যার! আপনি সিন্দুকটা উদ্ধার করার জন্য কলকাতা

থেকে এখানে আসছেন, তা তো সবাই জানে!

কাকাবাবু প্রবীরের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী ব্যাপার বলো

তো? আমি আমি যে এখানে আসব, তা আগে থেকে কে রটিয়ে দিয়েছে? আর সিন্দুকটার সঙ্গেই বা আমার নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন?

প্রবীর বলল, কে রটিয়েছে, তা তো আমি জানি না। আমি কাউকে বলিনি। মানে, বলার কথা মনেই আসেনি। কমলিকা–

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, ওসব কথা বলতে আমার বয়েই গেছে!

প্রবীর বলল, আমি তো জানি, আপনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছেন। কোনও কাজের জন্য আসেননি!

সন্তু বলল, কাল রেল স্টেশনেই একটা লোক বলেছিল...

জোজো বলল, সে লোকটা জ্যোতিষী!

সন্তু বলল, আর-একজন চোখ-বোজা সাধু, সেও মনে হল জানে।

কাকাবাবু বললেন, উঃ, এখানটায় দারুণ রোদ। আর দাড়াতে পারছি।

জোজো বলল, এবার ফিরে যাওয়া যাক। খিদে পেয়ে গেছে!

কমলিকা বলল, তোমরা দিব্যগড় যাবে না? আগে দিব্যগড় দেখে নাও!

জোজো বলল, খালি পেটে কোনও দুর্গ দেখতে নেই, মহাভারতে লেখা আছে!

সন্তু বলল, মহাভারতে না, বাইবেলে!

কমলিকা আর আপত্তি করল না। চোখ কুঁচকে একটু ভেবে বলল, খাওয়ার পরে যাওয়াই ভাল। খেতে দেরি হলে বাবা আপত্তি করবেন। চলুন বাড়ি ফিরে যাই।

দুপুরে দারুণ খাওয়াদাওয়া হল।

এরকম ভাঙা বাড়ি। সারা বছর প্রায় কেউই থাকে না, তবু যত্নের কোনও ত্রুটি নেই। তিনরকম মাছ কী করে জোগাড় হল, তাই-ই বা কে জানে? এখানে এত ভাল রাবড়ি পাওয়া যায়। কমলিকা খুব যত্ন করে খাওয়াল।

তারপরই সে বলল, কাকাবাবু এবার চলুন, দুর্গ দেখতে যাই। কিংবা রোদ্দুরের মধ্যে আপনার যেতে কষ্ট হবে?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক বলেছ! এত খাওয়ালে, এরপর একটু বিশ্রাম না নিলে কি চলতে পারে? এখন একটু বিছানায় শুয়ে গড়াব। আমার পা দুটোকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দিতে হয়।

কমলিকা বলল, তা হলে সন্তু আর জোজো চলুক!

জোজো বলল, রোদ্দুরের মধ্যে দুর্গ দেখার বারণ আছে উপনিষদে।

কমলিকা চোখ পাকিয়ে বলল, আবার বাজে কথা! আমি বুঝি বুঝি না? ওসব কিছু লেখা নেই। চলো, চলো...

সন্তু জোজোকে বলল, ঠিক আছে, চল রে সন্তু, ঘুরেই আসি!

কমলিকা প্রায় জোর করেই ওদের দুজনকে নিয়ে গেল বেড়াতে।

কাকাবাবু ঘরে এসে শুয়ে পড়লেন।

সেই হিসেবের খাতাটা পড়তে লাগলেন মন দিয়ে।

৫. সন্তু আর জোজো কমলিকার সঙ্গে

সন্তু আর জোজো কমলিকার সঙ্গে নীচে নেমে এল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, প্রবীর যাবে না?

কমলিকা বলল, না। বাবা দাদাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছেন কিছু জিনিসপত্র কিনে আনার জন্য।

জোজো বলল, জিপগাড়িটাও তো নেই, তা হলে আমরা যাব কীসে?

কমলিকা বলল, হেঁটেই যাব। খুব বেশি দূর তো নয়!

জোজো বলল, এই রোদ্দুরের মধ্যে আমি বেশি হাঁটতে পারব না।

কমলিকা বলল, আহা-হা! একেবারে মোমের শরীর। আমি হাঁটতে পারি, আর তুমি পারো না। তাও তো এখানে শাড়ি পরে হাঁটতে হয়। সালোয়ার কামিজ পরলে দৌড়োতাম।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুমি জিন্স পরো না?

কমলিকা বলল, কলকাতায় জিন্স পরেই তো নাচের ক্লাসে যাই!

জোজো বলল, তুমি নাচ শিখছ? ধেই ধেই, না তাতা থই থই?

কমলিকা বলল, ও আবার কী! আমি শিখছি মণিপুরী।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তার দিকে না গিয়ে, ওরা ডান দিকে হাঁটতে লাগল বাগানের মধ্য দিয়ে। এককালে বাগান ছিল, এখন প্রায় কিছুই নেই। অযত্নে সব নষ্ট হয়ে গেছে। বড় বড় ঘাস আর জংলি গাছ, তার মধ্য দিয়ে সব পায়ে হাঁটা- পথ।

সন্তু বলল, এককালে এই বাড়িটা কত সুন্দর ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। আর কিছুদিনের মধ্যে একেবারেই ভেঙে পড়বে!

জোজো বলল, সারিয়ে টারিয়ে নিলে এখনও সুন্দর করা যায়।

সন্তু বলল, এত বড় বাড়ি মেরামত করতে কত টাকা লাগবে, ভাবতে পারিস?

কমলিকা বলল, আমাদের অত টাকাই নেই! যাও বা একটা সিন্দুক পাওয়া গেল, সেটার মধ্যে যদি অনেক সোনার টাকা আর মণি-মুক্তো থাকত, তাও সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেল। অবশ্য সিন্দুকটা থাকলেই বা কী হত? বাবা বলেছিলেন, ও সিন্দুক থেকে একটা পয়সাও নেওয়া চলবে না। সব গভর্নমেন্টকে দিয়ে দিতে হবে।

বাগানটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সামনে একটা পুকুর। ডান দিকে একটা সুরকির রাস্তা।

সেই রাস্তা ধরে বাড়িটার পিছন দিকে এসে পড়া গেল।

সেখানে কিছু বড় বড় গাছ, অনেকটা জঙ্গলের মতন। জঙ্গলের ফাঁকে একটা ভাঙা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে কমলিকা বলল, ওই তো সেই দুর্গ!

সন্তু বলল, এত কাছে?

জোজো বলল, ধ্যাৎ! ওটা আবার দুর্গ নাকি? একটা ভাঙাচোরা বাড়ি!

কমলিকা বলল, ইয়েস স্যার, ওটাই দুর্গ। ছোট হলে কী হয়, বড় বড় কামান আছে।

জোজো বলল, ওই পচা দুর্গ দেখার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। যাব না। আমি সারা পৃথিবীর কত দুর্গ দেখেছি!

কমলিকা বলল, এই দুর্গটার মধ্যে একটা খুব সুন্দর ছোট্ট পুকুর আছে। তাতে পদ্মফুল ফোটে। সেরকম কোথাও দেখেছ?

জোজো বলল, কত! হাঙ্গারিতে একটা দুর্গের মধ্যে পুকুর নয়, আছে আস্ত একটা লেক। তাতে সারা বছর ফুটে থাকে ওয়াটার লিলি। আর তার মধ্যে আছে তিনটে পোষা কুমির।

কমলিকা চোখ বড় বড় করে বলল, সত্যি?

জোজো বলল, সত্যি না তো কী, ফ্যাক্ট! নিজের চোখে দেখেছি!

কমলিকা বলল, এই পুকুরটার মধ্যেও একটা দারুণ জিনিস আছে। গেলেই দেখতে পাবে!

সন্তু বলল, কী? তিমি মাছ?

কমলিকা বলল, ভ্যাট। পুকুরে বুঝি তিমি মাছ থাকে? এ-পুকুরটার মাঝখানে আছে একটা পাথরের পিলার। সেটাতে যদি একটা ঢিল ছুড়ে লাগাতে পারো, দেখবে ঠিক সা-রে-গা-মা-র মতন সুর শোনা যাচ্ছে!

জোজো বলল, ধ্যাৎ। এ মেয়েটা এমন কাঁচা গুল মারে যে শুনলেই বোঝা যায়, মিথ্যে কথা। সন্তু, তুই যাবি তো যা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে

না।

সন্তু বলল, চল, জোজো, মেয়েটা এত করে বলছে। একবার ঘুরে আসি। বেশি সময় লাগবে না!

কমলিকা বলল, কে সন্তু? কে জোজো?

সন্তু বলল, আমরা নাম বদলের খেলা খেলছি। আমি আসলে জোজো, এখন থেকে সন্তু হয়ে যাচ্ছি। আর সন্তু হচ্ছে জোজো! তাই না রে জোজো?

জোজো বলল, তার মানে, তুমি আমাকে সন্তু ডাকতে পারো, জোজো ডাকতে পারো। হোয়াটস ইন আ নেম!

এই সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথায় সামান্য টাক, চোখে চশমা। তার হাতে একটা লোহার হাতুড়ি।

জোজো বলল, লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

সন্তু বলল, আরে, এই তো সেই ট্রেনের চোখ-বোজা সাধু। চেহারা আর পোশাক টোশাক একেবারে পালটে ফেলেছে।

জোজো বলল, হ্যাঁ, ঠিক তো!

লোকটি ওদের দেখতে পেয়েছে। কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে বলল, কলকাতার অতিথি। বলেছিলুম না আবার দেখা হবে! তোমাদের কাকাবাবু কোথায়?

সন্তু খুবই অবাক হয়ে গেছে। সে উত্তর না দিয়ে বলল, আপনার চোখ খোলা!

লোকটি বলল, হ্যাঁ, মাসে পনেরো দিন আমার চোখ খোলা থাকে। আজ থেকে সেটা শুরু।

কমলিকা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

লোকটি বলল, আমি একজন সাধু। এই দুজনের সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়েছিল। মানে, ওরা আমাকে দেখেছিল।

কমলিকা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কী করছেন?

লোকটি বলল, সাধুরা তো কিছু করে না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমিও তাই করছি।

আপনার হাতে ওটা কী?

হাতুড়ি। সব সময় সঙ্গে রাখি। যদি হঠাৎ সামনে একটা বাঘ এসে পড়ে। মন্তর দিয়ে তো বাঘকে বশ করা যায় না। তাই এটা দিয়ে ভয় দেখাই। তোমরাও এখানে বেশিক্ষণ থেকো না। দু-একদিন আগে একটা বাঘ পড়েছিল এদিকে।

লোকটি চলে গেল সুরকির রাস্তার দিকে।

কমলিকা বলল, এই সব জায়গাটাই আমাদের। বাইরের লোক যখনতখন ঢুকে পড়ে। কী আর করা যাবে। পাহারা দেওয়ার তো লোক নেই।

আর-একটু হাঁটতেই ভাঙা দুর্গটা পুরোপুরি দেখা গেল। সেটা একেবারেই ভাঙা। উপরের দিকে বটগাছ গজিয়ে গেছে। শক্ত শিকড় দিয়ে যেন মড়মড়িয়ে ভাঙছে বাড়িটার হাড়-পাঁজরা।

সামনে পড়ে আছে একটা লম্বা কামান।

কমলিকা বলল, দেখলে দেখলে, এটা দুর্গ ছিল কি না?

জোজো মুখ বিকৃত করে বলল, এটা একেবারে যা-তা কামান। মরচে ধরা। আমি দলমাদল কামান দেখেছি! বোঝাই তো যাচ্ছে, এখানে দেখার কিছু নেই। চল, সন্তু।

কমলিকা বলল, ভিতরের পুকুরটা দেখবে না?

জোজো বলল, সেটা দেখতেই হবে?

কমলিকা জোর দিয়ে বল, হ্যাঁ, দেখতেই হবে। তুমি কে, জোজো না সন্তু?

জোজো বলল, আমি এখন জোজো। আগে সন্তু ছিলাম। আবার সন্তু হয়ে যেতেও পারি।

সন্তু বলল, চল, বলছে যখন, দেখে আসি পুকুরটা! ভাঙাচোরা পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওরা চলে এল দুর্গটার মধ্যে।

সন্তু বলল, আমার মনে হয়, আগে এখানে এই দুর্গ-কাম-বাড়িটাই ছিল। (কোনও কারণে এটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সামনের বড় বাড়িটা তৈরি হয়েছিল, সেটাও এখন ভাঙা।

ভোজো বলল, এ আর বেশিদিন থাকবে না। কই, পুকুর কোথায়?

সন্তু বলল, এই পুকুর!

সে হেসে ফেলল।

পুকুরের বদলে একটা বড় চৌবাচ্চাই বলা উচিত। দশ-বারো হাত চওড়া, সেরকমই লম্বা। জল দেখাই যায় না প্রায়, পানায় ঢেকে গেছে।

সন্তু বলল, এই পুকুরে রাজকন্যারা চান করত, তাই না? তাও বোধহয় একশো-দেড়শো বছর আগে!

জোজো বলল, কোথায় তোমার পদ্মফুল, রাজকুমারী? একটাও তো দেখতে পাচ্ছি না।

কমলিকা বলল, তাই তো, নেই তো?

সন্তু তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলল, আহা, পদ্মফুল তো সারা বছর ফোটে না! বসন্তকাল এসে দেখা যাবে।

জোজো বলল, আর সেই সা-রে-গা-মা গান গাওয়া পিলারটা?

কমলিকা বলল, সেটা বোধহয় জলে ডুবে গেছে!

সন্তু বলল, যথেষ্ট হয়েছে। এই রোদ্দুরে আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। পাথরগুলো পর্যন্ত তেতে গেছে। চল, সন্তু চল, ফিরে যাই।

কমলিকা বলল, আহা, এত তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার কী হয়েছে? ওই তো বাইরের গাছতলায় বেশ ছায়া রয়েছে। ওইখানটায় বসবে চলো না।

জোজো বলল, বসে কী করব?

কমলিকা বলল, আমরা গল্প করব।

সন্তু বলল, বাড়িতে গিয়েও তো গল্প করা যায়। এখানে সত্যি খুব গরম।

কমলিকা বলল, ধুৎ, বাড়ির মধ্যে সর্বক্ষণ বুঝি ভাল লাগে? ওখানে ছায়ায় বসলে বেশ আরাম লাগে। এসো, একটুখানি বসেই দ্যাখো!

জোজো বলল, তুমি গল্প শোনাবে? কীসের গল্প?

কমলিকা বলল, অনেক গল্প আছে। গান শোনাতেও পারি। এসো, এসো, প্লিজ।

সন্তু বলল, চল, জোজো। বেশিক্ষণ না কিন্তু বড়জোর দুটো গান শুনব। দুর্গটার বাইরে কয়েকটা বড় বড় গাছের মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে ছায়া পড়েছে ঠিকই।

ঘাসের উপর একটা গোল চাটাই পাতা। সেটাও অনেকদিনের পুরনো।

কমলিকা বলল, তোমরা ওটায় গিয়ে বসো। আমি একটু আসছি।

সন্তু আর জোজো দাঁড়াল চাটাইটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল!

আনন্দের চোটে হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল কমলিকা।

৬. কাকাবাবু অনেকক্ষণ ধরে বিছানায়

কাকাবাবু অনেকক্ষণ ধরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে হিসেবের খাতাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়।

বিকেলের দিকে তার ঘুম ভাঙল। জানলার বাইরে ঝকঝক করছে রোদ। সন্তু আর জোজো ফেরেনি। তিনি ভাবলেন, এই রোদ্দুরে কোথায় ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে!

তিনি খাট থেকে নেমে দরজাটা খুলে বাইরে মুখ বাড়ালেন।

বারান্দার এক কোণে দেখা গেল কমলিকাকে।

সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, কফি?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, কফির তেষ্টা পেয়েছে। তুমি ঠিক বুঝেছ তো!

একটু পরেই কমলিকা ট্রে-তে করে কফির পট, কাপ আর বিস্কুট নিয়ে এল।

কাকাবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ ভাল বানিয়েছ।

কমলিকা বলল, বিস্কুট নিন।

কাকাবাবু বললেন, দুপুরে এত খাইয়েছ, এখন আর কিছু খেতে পারব। আজ বোধহয় আর বৃষ্টি হবে না।

কমলিকা বলল, আকাশে একটুও মেঘ নেই। তবে, এখানে মেঘ না থাকলেও হঠাৎ ঝড় আসে। জঙ্গলের দিক থেকে। একবার ঝড়ের সময় তিনটে হরিণ চলে এসেছিল এ-বাড়ির সামনে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী হল? হরিণগুলোকে কেউ মারেনি তো?

কমলিকা বলল, না, না, আমার বাবা কোনও জীবজন্তু মারতে দেন না। কেউ গাছ কাটলেও রেগে যান খুব। বাবা যদি এখানে না থাকতেন, তা হলে ছোটকাকা অন্তত একটা হরিণ মারতই ঠিক। মাংস খাওয়ার জন্য। ছোটটাকা তো শিকারি। একবার নাকি একটা জিরাফ মেরেছিল সিমপলিপাল জঙ্গলে।

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, জিরাফ! এই জঙ্গলে জিরাফ আসবে কোথা থেকে?

কমলিকা বলল, তা হলে বোধহয় জেব্রা।

কাকাবাবু বললেন, আমাদের দেশে জেব্রাও নেই। বুনো গাধা আছে। কোথাও কোথাও!

কমলিকা বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাধা। না, না, গাধাও নয়, কুকুর।

কাকাবাবু বললেন, হঠাৎ কুকুর মারতে যাবেন কেন?

কমলিকা বলল, এমনি কুকুর নয়, জঙ্গলের কুকুর!

কাকাবাবু বললেন, জংলি কুকুর খুব হিংস্র হয় বটে, ইংরেজিতে যাদের বলে ওয়াল্ড ডগস! তাদের মারা তো খুবই শক্ত। তোমার কাকা তা হলে খুব ভাল শিকারি।

কমলিকা বলল, ছোটকাকা একবার সাপের মাংস খেয়েছিল। মস্তবড় একটা কেউটে সাপকে আগে পিটিয়ে মারল। তারপর বলল, এটাকে রান্না করে খাব। আমাদের রান্নার মাসি রান্না করতে রাজি হল না, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। ছোটকাকা তখন নিজেই রান্না করল। আর কেউ যায়নি অবশ্য।

কাকাবাবু বললেন, চিন দেশের লোকেরাও তো সাপ খায়। সাপের মাথাটা কেটে ফেললে, সারা গায়ে তো বিষ থাকে না, বিষ থাকে শুধু দাতে।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পালটে কমলিকা বলল, আচ্ছা কাকাবাবু, সন্তু আর জোজো তো অনেকবার অনেকরকম বিপদে পড়েছে, তাই না? ওরা নিজে নিজেই উদ্ধার পেয়েছে, না আপনি সবসময় সাহায্য করেন?

কাকাবাবু বললেন, নিজে নিজেই অনেকবার বিপদ থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার সাহায্যের দরকারই হয়নি। বরং আমাকেই ওরা সাহায্য করে।

কমলিকা বলল, যদি একটা নদীর মধ্যে পড়ে যায়? খুব স্রোত?

কাকাবাবু বললেন, সন্তু খুব ভাল সাঁতার জানে। জোজো জানে না বটে, সন্তু ওকে পিঠে নিয়ে চলে আসতে পারে। সন্তু ভাল ক্যারাটে জানে। গাছে উঠতে পারে। আর জোজো ওর মুখের কথা দিয়ে অন্যদের মাত করে দেয়।

কমলিকা বলল, যদি মরুভূমিতে হারিয়ে যায়?

কাকাবাবু বললেন, সেরকম কখনও হয়নি বটে। কিন্তু একবার আমরা ইজিপ্টে উটের পিঠে চেপে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে একটা পিরামিড দেখতে গিয়েছিলাম।

কমলিকা আবার বলল, যদি কোনও গর্তে পড়ে যায়?

কাকাবাবু বললেন, সেরকম তো কতবার হয়েছে। একবার একটা বিরাট সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গেছি, সেখানে একটা সাপ ছিল, সেটা বিজয়নগরের বিখ্যাত হিরেটা উদ্ধার করার সময়।

কমলিকা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে খুব সরলভাবে বলল, তা হলে আমি যে ওদের বাঘের ফাঁদে ফেলে দিলাম, সেখান থেকে এখনও উঠতে আসতে পারল না কেন?

কাকাবাবু আঁতকে উঠে বললেন, কোথায় ফেলে দিয়ে এলে?

কমলিকা বলল, বাঘের ফঁদে।

কাকাবাবু বললেন, সেটা আবার কী?

কমলিকা বলল, সেটা দুর্গটার কাছেই। একটা গর্ত। উপরে চাটাই চাপা দেওয়া থাকে, কেউ বুঝতে পারে না। ওটা বাঘ ধরার জন্য।

কাবাবু বললেন, সেখানে তুমি ওদের ইচ্ছে করে ফেলে দিলে?

কমলিকা বলল, না, না, ওর মধ্যে বাঘ নেই কিন্তু। এমনি গর্ত। সন্তু আর জোজো ওখান থেকে উঠে আসতে পারে কি না দেখছিলাম। কিন্তু এখনও তো এল না। ভেবেছিলাম এই কথাটা আপনাকে বলব না। কিন্তু আমি তো মিথ্যে কথা বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারি না। মজা করছিলাম ওদের নিয়ে। আমি আর দাদা আরও কয়েকজন ওখানে কতবার লুকিয়েছি। ভিতরে খাঁজ কাটা আছে, মানুষ উঠে আসতে পারে, বাঘ পারে না!

কাকাবাবু বললেন, তুমি ওদের ফেলে দেওয়ার আগে দেখেছিলে, গর্তটার মধ্যে কিছু আছে কি না?

কমলিকা বলল, তা কী করে দেখব? আমি তো কাছে যাইনি।

কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটি বগলে নিলেন।

তারপর বললেন, শিগগির চলো তো, কোথায় তুমি ওদের ফাঁদে ফেলেছ, আমাকে দেখিয়ে দাও!

কমলিকা ঠোঁট উলটে বলল, এমা, ছি, ছি, ওরা বুঝি নিজেরা উদ্ধার হতে পারে না? সব সময় আপনার সাহায্য লাগে?

কাকাবাবু বললেন, আর দেরি না করে, চলো এক্ষুনি সেখানে যেতে হবে! কত দূরে?

কমলিকা বলল, খুব কাছে। গাড়িও লাগবে না।

কাকাবাবু সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে গিয়ে ক্রাচ পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। কোনওরকমে দেওয়াল ধরে সামলে নিলেন।

বাড়ির বাইরে আসার পর কমলিকা বলল, আপনি আমাকে একবার গর্তটার মধ্যে ফেলে দিন। দেখবেন, আমি নিজে নিজে কী করে ঠিক উঠে আসব।

জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে কাকাবাবু বললেন, ওই গর্তে কখনও বাঘ পড়েছিল?

কমলিকা বলল, বাবা বলেন, অনেকদিন আগে এদিকে বাঘ আসত। এখন আর আসে না। তবে, আমরা যখন কলকাতায় ছিলাম, দুমাস আগে একটা বাঘ এসে ওই ফাঁদে পড়েছিল, ছোটকাকা বলেছে। সে বাঘটাকে কিন্তু আর কেউ দেখেনি। ছোটকাকা নিজেই বাঘটাকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু জগোদাদা আমাদের চুপিচুপি বলেছে, মোটেই বাঘ ধরা পড়েনি, ওটা ছোটকাকা আমাদের বলেছে ভয় দেখানোর জন্য। জানেন, চোটকাকা বাঘের ডাক ডাকতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি?

কমলিকা বলল, হ্যাঁ। একটা মাটির হাঁড়ির মধ্যে মুখ দিয়ে উম উম শব্দ করলে ঠিক বাঘের ডাকের মতন শোনায়। একবার ওইরকম ডেকে সবাইকে ভয় দেখিয়ে দিল।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, তোমার ছোটকাকার তো অনেক গুণ! ভাল থিয়েটারও করেন শুনেছি।

বাগানের দিকটা পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকবার সময় কমলিকা হঠাৎ থমকে দাড়াল।

তারপর মুখটা অন্ধকার করে বলল, সন্তু আর জোজোর সত্যি যদি কোনও বিপদ হয়, তা হলে আমাকে বকবেন না তো? আমি কিন্তু মজা করার জন্যই ওদের ফেলে দিয়েছিলাম।

কাকাবাবু বললন, না রাজকুমারী, তোমাকে বকব না। তবে, এরকম মজা করা উচিত নয়। আচমকা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলে হাত-পা-ও ভাঙতে পারে।

কমলিকা বলল, না। তলাটা নরম। খুব নরম মাটি। আমি কতবার পড়েছি। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারেন।

কাকাবাবু বললেন, না, আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দেব না। বিকেল প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আকাশে জমেছে কালো মেঘ। আজ আবার বৃষ্টি হতে পারে। তাই এখন অসহ্য গুমোট। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।

রাজবাড়ির পিছন দিকে আসার পর আঙুল দেখিয়ে কমলিকা বলল, ওই দেখুন। সেই দুর্গ।

গাছের ফাঁক দিয়ে ভাঙা বাড়িটা দেখতে পেয়ে কাকাবাবু বললেন, এত কাছে?

তার কপাল কুঁচকে গেল। আপনমনে বললেন, এখানে বাঘ ধরার ফাঁদ?

কমলিকা বলল, আর-একটু কাছে চলুন দেখতে পাবেন।

আগের রাত্তিরের অত বৃষ্টির জন্য এখানকার মাটি কাদা কাদা হয়ে আছে, কাকাবাবুর ক্রাচ বসে যাচ্ছে।

ভাঙা দুর্গটা ঘুরে সেই বড় বড় গাছপালায় ঘেরা জায়গাটায় এসে পৌঁছোলেন ওঁরা। সেই গোল চাটাইটা একইভাবে পাতা আছে।

কমলিকা বলল, আমি সন্তু আর জোজোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওই চাটাইটার উপর দাড়ালেই, ভুস! একেবারে নীচে চলে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, চাটাইটা সুদ্ধ নীচে চলে যায়?

কমলিকা বলল, না, না, চাটাইটা একপাশে হেলে পড়ে যায়। তখন গড়িয়ে পড়ে যেতে হয়।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর চাটাইটা কি একপাশে হেলেই থাকে? না কাউকে ঠিক করে দিতে হয়?

কমলিকা বলল, তা আমি জানি না। আগে তো গর্তটা এরকম ঢাকা থাকত না। গাছের ডালটাল থাকত। এখন যাতে কেউ ওখানে না পড়ে যায়, সেইজন্য ঢাকা দেওয়া থাকে।

কাকাবাবু আর-একটু এগোতেই কমলিকা বলল, সাবধান, সাবধান!

কাকাবাবু সেকথা না শুনে কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে এক টানে চাটাইটা সরিয়ে দিলেন।

গর্তের মুখটা চৌকো ধরনের।

ভিতরটা আবছা মতন, তলা পর্যন্ত দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, টর্চটা আনলে ভাল হত।

তারপর তিনি জোরে ডাকলেন, জোজো, সন্তু?

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কমলিকা কিছু না বলে দৌড়ে এসে ঝাপ দিল গর্তটার মধ্যে।

তারপর তলা থেকে হাসতে হাসতে বলল, এই দেখুন কাকাবাবু, আমার পা ভাঙেনি, কিছুই হয়নি। সন্তু আর জোজো কিন্তু এখানে নেই।

কাকাবাবু বললেন, ওখানে কোনও দরজা কিংবা গর্তটর্ত আছে।

অন্যদিকে যাওয়ার জন্য?

কমলিকা বলল, না তো! কোনওদিনও ছিল না।

কাকাবাবু বললেন, তবু, ভাল করে হাত বুলিয়ে দ্যাখো তো?

কমলিকা বলল, এই তো দেখছি। না, আর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, তুমি এখন উঠবে কী করে? আমার একটা ক্রাচ ঝুলিয়ে দিচ্ছি, তাই ধরে ধরে উঠতে পারবে?

কমলিকা বলল, তার দরকার হবে না। দেখুন না!

একটু পরেই গর্তটার গা বেয়ে বেয়ে উঠে এল কমলিকা। প্রথমে দেখা গেল তার সুন্দর মুখোনি। খুশিতে ঝলমল করছে সেই মুখ।

বলল, সন্তু আর জোজো ওখানে নেই। তার মানে, ওদের কোনও বিপদ হয়নি! আমার কোনও দোষ নেই, দোষ নেই।

কাকাবাবু বললেন, তুমি এত সহজে উঠে এলে, ওরা তো পারবেই!

কমলিকা বলল, ছোট ছোট খাঁজ কাটা আছে। মানুষ উঠতে পারে, কোনও জন্তু-জানোয়ার পারবে না। অবশ্য বাবা বলেছেন, মানুষও একটা জন্তু, কিন্তু মানুষ দুটো হাত ব্যবহার করতে পারে। অন্য কোনও জন্তু তা পারে না।

কমলিকার সাদা শাড়িতে বেশ খানিকটা কাদা লেগে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, এখান থেকে উঠে সন্তু-জোজোরা বাড়ি না ফিরে কোথায় গেল? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।

কমলিকা বলল, কতক্ষণ আর লুকিয়ে থাকবে? খিদে পেলেই ফিরে আসবে সুড়সুড় করে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি ওদের সঙ্গে মজা করার জন্য গর্তে ফেলে দিয়েছিলে, এবার ওরাও তোমার সঙ্গে মজা করার জন্য প্রতিশোধ নেবে। কী করবে কে জানে। তুমি সাবধানে থেকো।

কমলিকা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, ওরা আমার কচু করবে! আমাকে বিপদে ফেলা অত সোজা নয়!

৭. গর্তে পড়ে যাওয়ার পর

গর্তে পড়ে যাওয়ার পর সন্তু আর জোজো দুজনেই প্রথমটা হকচকিয়ে গেল।

সন্তু বলল, এটা কী ব্যাপার হল রে জোজো?

জোজো বলল, উঃ উঃ, আমার খুব লেগেছে। আমার পা ভেঙে গেছে বোধহয়!

সন্তু বলল, যাঃ, তোর যখন-তখন পা ভাঙে। এখানে তো নরম মাটি দেখছি। আমার কিছু হয়নি।

জোজো বলল, পা ভাঙেনি বোধহয়। কিন্তু কীসে যেন খোঁচা লাগল, সাপে কামড়াল নাকি?

সন্তু বলল, সাপ আবার কোথায়? এখানে কিছু নেই। সাপ থাকলে ফেঁসফোসানি শোনা যেত!

জোজো বলল, ওই দুষ্টু মেয়েটা আমাদের ইচ্ছে করে এখানে ফেলে দিয়েছে। ও নিশ্চয়ই শত্রুদের দলের।

সন্তু বলল, শত্রু আবার কে? আমরা কি কারও কোনও ক্ষতি করেছি?

জোজো বলল, এখন কী হবে? আমরা এই গর্তের মধ্যে না খেয়ে মরব।

সন্তু বলল, দাড়া না, দেখা যাক কী করা যায়।

গর্তটার দেওয়ালে হাত বোলাতে বোলাতে সন্তু খাঁজ কাটা দিকটা পেয়ে গেল। সেদিকটা ধরে ধরে একটুখানি উঠে সন্তু বলল, এই তো উপরে ওঠার ব্যবস্থা আছে। চলে আয় জোজো।

জোজো বলল, তুই এদিকে আয়। এখানে বেরোনোর রাস্তা।

সন্তু সেখানে এসে দেখল, দেওয়ালের একটা অংশ ফাঁকা। সেখান দিয়ে একটা গোল সুড়ঙ্গের মতন দেখা যাচ্ছে।

সন্তু বলল, ওদিকে একটা দিকে দেওয়াল ধরে ধরে খাঁজে পা দিয়ে উপরে ওঠা। এদিকটায় ভিতরের দিকে যাওয়া যেতে পারে। কোন দিকে যাবি?

জোজো বলল, চল, উপরে উঠে যাই। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসবে।

সন্তু বলল, আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে, এই ভিতরের দিকটায় কী আছে দেখে আসি।

জোজো বলল, কী দরকার ওসব ঝঞ্ঝাট করে? অচেনা সুড়ঙ্গ টুড়ঙ্গের মধ্যে না যাওয়াই ভাল।

সন্তু বলল, রবীন্দ্রনাথের একটা গান আছে: অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে/ অচেনাকে চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে...।

জোজো বলল, ওসব গানের মধ্যে শুনতেই ভাল লাগে। যদি ওই সুড়ঙ্গটার মধ্যে অজগর সাপ থাকে?

সন্তু ততক্ষণে সুড়ঙ্গটার মধ্যে মাথা গলাতে গলাতে বলল, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমি আমি খাব পেড়ে। যেখানে সেখানে মোটেই অজগর সাপ থাকে না।

জোজো বলল, আমার ইচ্ছে করছে, এক্ষুনি উপরে উঠে গিয়ে ওই দুষ্টু মেয়েটার চুল টেনে দিতে।

সন্তু বলল, সে তো পরেও করা যেতে পারে। আগে এদিকটা দেখে নিই। আয়, ভিতরে চলে আয়।

সুড়ঙ্গটা বেশ সরু, দুদিকের দেওয়ালে হাত দিয়ে, মাথা নিচু করে কোনওরকমে একজন একজন করে এগোতে পারে।

কয়েক পা এগোনোর পর সন্তু বলল, এই সুড়ঙ্গটা কীসের বুঝতে পারছিস? আজ দুপুরে একটা পুকুর পাড়ের ভাঙা বাড়িতে যে সুড়ঙ্গটা দেখেছিলাম, বোধহয় সেইরকম।

কমলিকাদের বাড়ি থেকে এটা একটা পালানোর রাস্তা। কিংবা একসময় ওই ভাঙা দুর্গটা থেকেও এই পথে ও-বাড়িতে যাওয়া যেত।

জোজো বলল, তার মানে, তুই বলছিস, এইভাবে যেতে যেতে আমরা কমলিকাদের বাড়ির একতলায় পৌঁছে যাব? উঃ, উঃ!

সন্তু বলল, কী হল?

জোজো বলল, মাথা ঠুকে গেল! এত কষ্ট করে যাওয়ার দরকার কী রে সন্তু? উপর দিয়েই তো সোজা যাওয়া যেত।

সন্তু বলল, আমাদের ধারণাটা ঠিক কি না, তা মিলিয়ে দেখতে হবে না? আমার আরও একটা কথা মনে হচ্ছে। একটু আগে আমরা যে চোখ-বোজা সাধুবাবাকে দেখলাম, আজ একেবারে চোখ-খোলা, পোশাকও অন্যরকম, সে এই সুড়ঙ্গ থেকেই ওপাশে বেরিয়েছে?

জোজো বলল, হ্যাঁ, ওকে আচমকা দেখা গিয়েছিল, যেন মাটি খুঁড়ে উঠল, ওরকম ফিলিং হয়েছিল। কিন্তু এই বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গে সাধুবাবা কী করবে? তপস্যা করবে?

সন্তু বলল, কিছু চুরি করার মতলব থাকতে পারে। সাধু সেজে অনেকে পাকা চোরও তো হয়। ওর হাতে একটা হাতুড়ি ছিল লক্ষ করিসনি?

জোজো বলল, হ্যাঁ, দেখেছি তো হাতুড়িটা। বলল, বাঘ মারার জন্য সঙ্গে রেখেছে। হাতুড়ি দিয়ে কেউ বাঘ মারতে পারে, এমন কথা জন্মে শুনিনি। মনে হয়েছিল, ঠাট্টা করছে

আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সন্তু, তোর ধারণা যদি সত্যিও হয়, তা হলেও সাধুবেশে পাকা চোরটি কমলিকাদের রাজবাড়ি থেকে কী চুরি করবে? প্রায় কিছুই তো নেই। তা ছাড়া, তখন ওর কাছে হাতুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না।

সন্তু বলল, চুরি করতে এসে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়েছে? হয়তো পরে জানা যাবে।

জোজো বলল, লোকটি কিন্তু ইংরেজি টিংরেজি জানে। বলেছিল, হাউন্ড অফ বাস্কারভিলস পড়েছে।

সন্তু বলল, ইংরেজি জানলে বুঝি চোর হতে পারে না? খবরের কাগজে দেখিস না, বড় বড় লোক কত টাকা চুরি করে!

জোজো বলল, আর কতক্ষণ যাব রে? এ যে ফুরোচ্ছেই না। কমলিকাদের বাড়ি তো এতটা দুর নয়।

সন্তু বলল, উপর দিয়ে গেলে কিছুই মনে হত না। এখানে এত কষ্ট করে যেতে হচ্ছে তো, তাই এত দূর মনে হচ্ছে। আমরা কিন্তু বেশিক্ষণ আসিনি।

জোজো বলল, আমার হাত ছড়ে যাচ্ছে। আমি একটু বিশ্রাম নেব।

দেওয়াল ছেড়ে সে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

সন্তু থেমে গিয়ে বলল, সুড়ঙ্গটা মনে হচ্ছে একটু একটু চওড়া হচ্ছে। এবার আর দুদিকের দেওয়াল ধরতে হবে না।

জোজো বলল, তোর যত উদ্ভট শখ! গর্তটা থেকে উপরে ওঠার ব্যবস্থা আছে যখন, তখন কষ্ট করে এদিকে আসার কী দরকার ছিল? চল। বরং ফিরে যাই।

সন্তু বলল, আবার অতটা ফিরে যাব? এখন সুড়ঙ্গটা চওড়া হচ্ছে, এখন আর এগোতে তত কষ্ট হবে না। চল, উঠে পড়।

আবার খানিকটা এগোতেই সুড়ঙ্গটা অনেক চওড়া হয়ে গেল, প্রায় একটা ঘরের মতন। সামনের দিকে এক জায়গায় মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু কিছু বলতে যেতেই হঠাৎ ঝুপ করে কী যেন উপর থেকে পড়ল গায়ের উপর।

জোজো চিৎকার করে উঠল, সাপ! সাপ! ওরে বাবা রে!

সন্তু প্রথমে খুব চমকে উঠেছিল। তারও সাপের কথাই মনে হয়েছিল, কিন্তু হাত দিয়ে দেখল, সাপ নয়, অনেকখানি দড়ি।

তারপর সেই দড়ি আঁট হয়ে জড়িয়ে গেল সারা গায়ে।

সন্তু বলল, আমরা জালে আটকা পড়েছি।

জোজো চেঁচিয়ে উঠল, এই, এই, কে জাল ফেলল? কে? খুলে দাও। আমার গলায় আটকে যাচ্ছে। খুলে দাও।

সন্তু বলল, হাত তুলতে পারছিস তো? হাত দিয়ে গলার কাছটা আলগা করে রাখ।

জোজো জিজ্ঞেস করল, এটা কী ব্যাপার হল রে সন্তু? কে জাল ফেলল?

সন্তু বলল, দেখা যাক। ঘাবড়াসনি। কেউ-না-কেউ আসবে নিশ্চয়ই।

জোজো বলল, ঘাবড়াব কেন? এই সামান্য দড়ির জাল দিয়ে তোকে আমাকে কে আটকাবে? তবে কিনা আমার পিঠের ডান দিকটা চুলকোচ্ছে, আমি ডান হাতটা নড়াতে পারছি না!

সন্তু বলল, এদিকে সরে আয়, দেখি যদি চুলকে দিতে পারি। ঠিক তখনই একটু দূরে একটা মশাল জ্বলে উঠল।

সেই মশালটা হাতে নিয়ে একজন লোক এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে।

জোজো বলল, একটা গন্ধ পাচ্ছিস সন্তু? একে বলে বিপদের গন্ধ।

সন্তু বলল, না, ওটা আগুনের গন্ধ। বদ্ধ জায়গায় আগুন জ্বললে এরকম একটা গন্ধ হয়।

জোজো বলল, লোকটা থপথপ করে আসছে। আমাদের মারবে নাকি?

সন্তু বলল, হঠাৎ মারতে যাবে কেন? আমরা কিছু দোষ করেছি?

যে লোকটি মশাল ধরে আছে, তার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একেবারে কাছে আসার পর বোঝা গেল, সে বেশ একজন তাগড়া জোয়ান লোক, মুখোনা এমনই কালো যে, মনে হয়, আলকাতরার পোঁচ দেওয়া।

সন্তু খুব অবাক হয়ে বলে উঠল, আরে, এ যে আমাদের সেই কালকের

ড্রাইভার!

জোজো বলল, ইয়েস। পলাতক গুরুপদ রায়। ইনি এখানে লুকিয়ে আছেন?

লোকটি কাছে এসে একদৃষ্টে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল।

সন্তু বলল, নমস্কার ড্রাইভারবাবু, কাল অ্যাক্সিডেন্টের পর আপনি কোথায় চলে গেলেন?

লোকটি চুপ।

সন্তু আবার বলল, আপনার কোথাও চোট লাগেনি তো? আমরা চিন্তা করছিলাম আপনার জন্য।

লোকটি এবারও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, ইনি কথা খরচ করতে চান না।

সন্তু বলল, ড্রাইভারবাবু, দেখুন তো, কোথা থেকে একটা জাল এসে আমাদের বেঁধে ফেলল! এটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ার ধরার জন্য। একটু খুলে দিন না প্লিজ।

জোজো বলল, কাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল বটে, কিন্তু আপনি খুব ভাল ড্রাইভার। অত স্পিডে চালাচ্ছিলেন, কিন্তু একটুও হাত কাঁপেনি।

লোকটি এবার জালের উপরের দিকে হাত রাখল।

জোজো বলল, দিচ্ছে, দিচ্ছে, খুলে দিচ্ছে। গুরুপদবাবু খুব ভাল লোক। কিন্তু ভোলার বদলে জালটা আরও আঁট হয়ে গেল।

জোজো বলল, উলটো দিকে, উলটো দিকে ঘোরান, তা হলে আলগা হয়ে যাবে।

সে-কথায় কর্ণপাত না করে লোকটি একটু সরে গেল। তারপর মশালটা আটকে দিল দেওয়ালের একটা হুকে। পিছন ফিরে চলে গেল জোরে জোরে হেঁটে।

জোজো বলল, যাঃ বাবা! কোনও কথাই শুনল না?

সন্তু বলল, হয়তো কানে শুনতেই পায় না। কালা!

জোজো বলল, কিংবা বোবা। বোবা হলে তো কালা হবেই। কিন্তু লোকটা মিটমিটে শয়তান। দেখলি না, চোখ দুটো কেমন কুটিলের মতন।

সন্তু বলল, আচ্ছা, ওর নাম গুরুপদ না গুরুচরণ? আমার মনে হচ্ছে, গুরুচরণ। নাম ভুল বললে অনেকে রেগে যায়।

জোজো বলল, গুরুপদ আর গুরুচরণে কোনও তফাত আছে? কোনটা গুরুতর? এমনও হতে পারে, ওর নাম নিবারণচন্দ্র।

সন্তু একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করে বলল, আগে তবু ভাল ছিল। ও এসে আরও আঁট করে দিয়ে গেল, কোনও হাতই তুলতে পারছি না।

জোজো বলল, এ তো দেখছি পাটের দড়ি। আমরা ছিড়তে পারব না? বেশ পুরনোও হয়ে গেছে। একবার আমরা লোহার জাল কেটে বেরিয়েছি, এই দড়ি তো কোন ছার!

সন্তু বলল, আমরা মানে?

জোজো বলল, তুই আর আমি। সিঙ্গাপুরে! সন্তু ভুরু কুঁচকে বলল, আমি তো কখনও লোহার জাল কেটে বেরোইনি। আর সিঙ্গাপুরেও যাইনি।

জোজো হা হা করে হেসে বলল, তুই সব ভুলে যাস। আমি ঠিক মনে রাখি। কিন্তু কথা হচ্ছে, কতক্ষণে জালটা ছেঁড়া হবে। আমি বেশিক্ষণ এভাবে থাকতে চাই না। আর- একটু পরেই তো খিদে পেয়ে যাবে।

সন্তু বলল, আমি কিন্তু পারছি না রে জোজো। অন্য কারও সাহায্য দরকার। আর তো কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

জোজো বলল, আমাদের এইভাবে জালে বেঁধে রেখে চলে গেল। লোকটা অতি নিমকহারাম।

এই সময় কিচ কিচ করে শব্দ হল। শব্দটা এদিকেই আসছে।

জোজো এতক্ষণ হালকা গলায় কথা বলছিল। এবার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, ওটা কীসের শব্দ রে?

সন্তু বলল, বোঝাই তো যাচ্ছে, ইঁদুর।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল একটা ধেড়ে ইঁদুর। প্রায় খরগোশের মতন সাইজ!

জোজো বলল, ওরে বাবা রে! এত্ত বড়! এখানে ইঁদুর এল কী করে?

সন্তু বলল, ইঁদুর কোথায় নেই। বোধহয় মঙ্গল গ্রহেও আছে। ইঁদুর দেখে অত ভয় পাওয়ার কী আছে? ইংদুর তো মানুষকে কামড়ায় না।

জোজো বলল, আমি জানি, এক ধরনের ইঁদুর মানুষের মাংস খায়।

প্রথমটার পিছু পিছু আরও তিনটে ইঁদুর বেরিয়ে এল। তারপর আরও চারটে।

একেবারে জালটার কাছে এসে ওদের দুজনের দিকে একটা ইঁদুর তাকিয়ে রইল জুলজুল করে। তার চোখ দুটো যেন দুটি আগুনের ফুলকি।

সন্তু ফিসফিস করে বলল, জোজো, একদম নড়বি না, চুপ করে থাক।

প্রথম ইঁদুরটা স্প্রিং-এর মতন এক লাফ দিয়ে উঠে জোজোর সামনের দড়ি কামড়ে ধরল।

জোজো দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে!

সে ঝটাপটি করে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল ইঁদুরটাকে।

তখন সব কটা ইঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়ল দড়ির জালের উপর।

মশালটাও নিভে গেল এই সময়।

৮. কাকাবাবু বসে আছেন রাজবাড়ির সামনে

কাকাবাবু বসে আছেন রাজবাড়ির সামনে বাগানে। নটবর সিংহ তাকে একটা চেয়ার এনে দিয়েছে।

আকাশে গুমগুম শব্দ হচ্ছে মেঘের। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু বৃষ্টি আসার নাম নেই।

হাওয়া বইছে বেশ জোরে। সেই হাওয়ায় ভেসে আসছে বনজঙ্গলের গন্ধ।

কাকাবাবু মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন। এখন রাত পৌনে নটা। সন্তু আর জোজো এখনও ফিরল না।

কাকাবাবুর দুশ্চিন্তা করা স্বভাব নয়।

গর্তটার মধ্যে পড়ে গিয়ে সন্তু আর জোজো আহত হয়নি, এইটুকু জানাই তো যথেষ্ট। ওরা উপরে উঠে কোথাও গেছে। ওরা নিজেদের দায়িত্ব নিতে পারে। তবু তিনি ঘড়ি দেখছেন ঠিকই।

কিরণচন্দ্র ভঞ্জদেওর জ্বর আবার বেড়েছে। কমলিকা বসে আছে তার পাশে। কাকাবাবু বারবার বলে দিয়েছেন, তার জন্য মোটেই ব্যস্ত হতে হবে না। কমলিকা এখন তার বাবার কাছেই থাকুক।

প্রবীর গেছে একজন বড় ডাক্তারকে ডেকে আনতে।

মাঝে মাঝে একা থাকতে ভালই লাগে কাকাবাবুর। অনেকরকম আকাশ তাল চিন্তা করা যায়।

সন্তু আর জোজোকে যে গর্তটায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেটার কথাই মনে পড়ছে বারবার।

কমলিকা বলেছিল, ওই গর্তটার নাম বাঘের ফাঁদ। কাকাবাবুর সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না। বাড়ির অত কাছে তো বাঘের জন্য ফাঁদ পাতা হয় না, সেরকম ফাঁদ পাততে হয় জঙ্গলের মধ্যে। বাড়ির অত কাছাকাছি বাঘ আসবে কেন? মানুষ যেমন বাঘ দেখে ভয় পায়, বাঘও তো মানুষকে দেখে ভয় পায়। খুব হিংস্র, মানুষখেকো বাঘও মানুষকে সামনাসামনি আক্রমণ করতে আসে না! লুকিয়ে লুকিয়ে পিছন দিক থেকে এসে ধরে। আর অধিকাংশ বাঘই মানুষখেকো নয়, তারা মানুষ দেখলে দূরে সরে যায়।

তা হলে ওই গর্তটা কীসের?

তার ক্রমশ দৃঢ় ধারণা হচ্ছে, ওটা একটা সুড়ঙ্গের বাইরের দিকের মুখ। দুপুরে একটা বাড়িতে সুড়ঙ্গ দেখা গিয়েছিল। এই রাজবাড়িতেও ওরকম পালানোর সুড়ঙ্গ থাকা স্বাভাবিক।

কিন্তু কমলিকা যে বলল, ওই গর্তটা দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায় না। ও মিথ্যে বলেনি। নিশ্চয়ই অনেকদিন আগে ভিতরের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব সুড়ঙ্গ এখন আর কেউ ব্যবহার করে না। মুখটা খোলা রাখলে, সাপটাপ, অন্য জন্তু-জানোয়ার বা চোরেরা ঢুকে। পড়তে পারে।

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। নটা পাঁচ। খাবারের সময় হয়ে গেল, জোজো তো কখনও এত দেরি করে না। খিদেয় ছটফট করে। হয়তো কোনও দোকানে টোকানে কিছু খেয়ে নিয়েছে।

রাজবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একজন লম্বা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ। জিন্স আর টি-শার্ট পরা, ঠোঁটে সিগারেট। হাতে একটা মোবাইল ফোন।

কাকাবাবু চিনতে পারলেন, এ-বাড়ির ছোট রাজকুমার রুদ্রকুমার ভঞ্জদেও।

কাছে এসে সে বলল, নমস্কার, নমস্কার রায়চৌধুরীবাবু, কেমন আছেন? সারাদিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। সেজন্য আমি লজ্জিত। দাদা অসুস্থ, আমারই উচিত ছিল আপনাদের দেখাশুনো করার। কিন্তু এমন ঘুম পেয়ে গেল, সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছি।

কাকাবাবু বললেন, না, না, আমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি। কমলিকা আর প্রবীর আমাদের যথেষ্ট দেখাশুনো করেছে।

রুদ্রকুমার জিজ্ঞেস করল, কিছু ঘুরেটুরে দেখলেন?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, মন্দিরের ওদিকটায় গিয়েছিলাম। যা গরম ছিল আজ, আর কোথাও যাওয়া হয়নি।

রুদ্রকুমার বলল, যা বলেছেন, বিচ্ছিরি গরম চলছে কয়েকদিন ধরে। বছরের এই সময়টায় এরকম হয়। তারপর নিয়মিত বৃষ্টি হয়ে গেলে ওয়েদারটা এত চমৎকার হয়ে যায়, তখন আর অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।

কাকাবাবু বললেন, কাল যদি গরমটা কম থাকে, তা হলে জঙ্গলের দিকে যাব ভাবছি।

রুদ্রকুমার বলল, যেতে ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন। আমি নিজে আপনাদের নিয়ে যাব। আমার চেয়ে জঙ্গল কেউ ভাল চেনে না। মাঝে মাঝে আমি একা একা জঙ্গলে চলে যাই। কোনও গাছতলায় চুপ করে বসে থাকি। কতরকম পাখির ডাক শুনি। সামনে দিয়ে হরিণের পাল চলে যায়, বুনো শুয়োর, খরগোশ। ময়ূরও আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাঘটাঘ দেখতে পান না?

রুদ্রকুমার বলল, নাঃ! বাঘ এখন অনেক কমে গেছে। খুব কমই দেখা যায়। আপনার ভাইপো আর তার বন্ধু গেল কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, গেছে কোথাও বেড়াতে।

রুদ্রকুমার বলল, এখানে অবশ্য তেমন ভয়টয় কিছু নেই। চোরডাকাতের উপদ্রবও প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, কাল রাত্তিরে অত বড় ডাকাতি কী করে হল, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। অমন ভারী সিন্দুকটা নিয়ে চলে গেল, নিশ্চয়ই ট্রাক নিয়ে এসেছিল। এরকম আগে কখনও ঘটেনি। কী লজ্জার ব্যাপার বলুন তো! আমাদের বাড়ি থেকেই জিনিসটা চলে গেল। তাও আপনি থাকতে থাকতে। দাদা আপনার উপর খুব ভরসা করেছিলেন। বারবার বলেছিলেন, আপনি এলেই সিন্দুকের রহস্যভেদ হয়ে যাবে!

কাকাবাবু একটুখানি বিরক্তভাবে বললেন, সবাই এই একই কথা বলছে। কেন, বুঝতে পারছি না। আপনার দাদা আমাকে সিন্দুকটার কথা ঘুণাক্ষরেও জানাননি। সিন্দুকের রহস্যভেদ করার জন্যও এখানে আসিনি। আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, একটা চেয়ার আনতে বলুন না।

রুদ্রকুমার বলল, না, আমার চেয়ার লাগবে না। আপনি সম্মাননীয় অতিথি, আপনি দেশবিদেশে কত রহস্যের সমাধান করেছেন। সবাই ভাবছে, আপনি চেষ্টা করলে কি সিন্দুকটা উদ্ধার করতে পারতেন না?

কাকাবাবু বললেন, আমি সিন্দুকটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে চাইনি। তবে, ইচ্ছে করলে অবশ্যই সেটা উদ্ধার করতে পারতাম। এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

রুদ্রকুমার দারুণ অবাক হওয়ার ভান করে, খানিকটা ঠাট্টার সুরে বলল, আপনি ইচ্ছে করলে পারতেন? তা হলে একটু ইচ্ছে করুন না প্লিজ! আমাদের খুব উপকার হয়।

ঠাট্টার সুরটা লক্ষ করে কাকাবাবু এবার কড়া গলায় বললেন, সিন্দুকটা কোথায় আছে, তাও আমি জানি!

রুদ্রকুমার এবার সত্যি সত্যি অবাক হয়ে বলল, তাও জানেন সত্যি? কোথায় আছে? ডাকাতদের আস্তানাটা আপনি চিনে ফেলেছেন?

কাকাবাবু বললেন, ডাকাতদের আস্তানায় যাওয়ার দরকার হয়নি। কেউ কেউ নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে। একটা ক্রাইম করার পর ভাবে, আমার এই নিখুঁত প্ল্যান কেউ বুঝতে পারবে না। তাই সে চুপচাপ না থেকে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। তাই ধরা পড়ে যায়।

রুদ্রকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, সিন্দুকটা কোথায় আছে বলুন না!

কাকাবাবু বললেন, এ-বাড়িতেই আছে। বাইরে কোথাও যায়নি। কাল রাতে ট্রাক নিয়ে কোনও ডাকাতের দল আসেনি।

রুদ্রকুমার এবার হেসে ফেলে বলল, এটা আপনি কী বলছেন? আপনি যত বড়ই রহস্যসন্ধানী হন না কেন, আপনার এ-কথাটা বিশ্বাস করা যায় না। এ-বাড়িতেই সিন্দুকটা কী করে থাকবে? পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। আমরাও খুঁজেছি। সিন্দুকটা বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, আপনি খুব ভাল থিয়েটার করেন, তাই না। আপনার থিয়েটারের দল আছে শুনলাম!

রুদ্রকুমার বলল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

কাকাবাবু বললেন, ভাল অভিনয়ের নিয়ম হচ্ছে, স্টেজে দাঁড়িয়ে অ্যাকটিং করার সময় সব কিছুই বেশি বেশি করতে হয়। বেশি জোরে হাসতে হয়। বেশি জোরে কাদতে হয়।

অনেকখানি ভুরু তুলতে হয় অবাক হলে। কিন্তু মাটিতে দাঁড়িয়ে, সামনাসামনি অন্য কারও সামনে ওরকম সবকিছু বেশি করলেই লোকে সন্দেহ করে।

রুদ্রকুমার বলল, হঠাৎ একথা বলছেন কেন? আমাকে অভিনয় শেখাচ্ছেন?

কাকাবাবু বললেন, না। আমি শেখাব কেন? আজ সকালে আপনি আমার সামনে স্টেজের অভিনয় করছিলেন। সিন্দুকটা চুরি হয়ে গেছে শুনে এমন অবাক হলেন যে, বোঝা গেল, ওটা অভিনয়। অর্থাৎ ওই চুরির কথা আপনি আগেই জানতেন। জিপগাড়ি থেকে নেমে এমন ব্যস্ততার ভান করলেন, যেন অনেক দূর থেকে আসছেন, বোঝা গেল সেটা অভিনয়। অর্থাৎ রাত্তিরে আপনি এ-বাড়িতেই ছিলেন। সারারাত জাগতে হয়েছিল। সিন্দুকটা টেনে বাইরে নিয়ে যাওয়ার দাগটা বারবার আমাকে দেখাতে চাইলেন। কিন্তু আমি আগেই দেখে নিয়েছি, ওই দাগ কেউ হাত দিয়ে করেছে। আপনিই রটিয়ে দিয়েছেন যে, বাইরে থেকে কেউ এসে ট্রাকে করে সিন্দুকটা নিয়ে গেছে।

রুদ্রকুমার বলল, আপনি তো অভিনয়ের খুব সমঝদার দেখছি। আপনার একটা কথাও মেলেনি। সিন্দুকটার গতিবিধি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। আপনার মতে যদি সিন্দুকটা এ-বাড়িতেই থেকে থাকে, তা হলে কোথায় আছে, আপনি দেখিয়ে দিতে পারবেন? তা হলে বুঝব আপনার মুরোদ।

কাকাবাবু এবার চওড়া করে হাসলেন।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্রকুমারের বাহুতে চাপড় মেরে বললেন, ছোটকুমার, আপনি আমার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। রাজা রায়চৌধুরীকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। আমাকে এর মধ্যে জড়িয়ে আপনি খুব ভুল করছেন।

রুদ্রকুমার তবু তেরিয়াভাবে বলল, আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। সিন্দুকটা দেখিয়ে দিতে পারলে আপনাকে দশ হাজার টাকা দেব।

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, আমার নিজের অনেক টাকা আছে। দশ হাজার তো নস্যি! আমি অন্যের কাছ থেকে টাকা নিই না। চলুন, সিন্দুকটা কোথায় দেখা যাক। এখন আমার নিজেরও একটু একটু আগ্রহ হচ্ছে জানার জন্য, সিন্দুকটার মধ্যে কী আছে।

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন বাড়ির দিকে। দরজার কাছে। একটা টুলে বসে নটবর সিংহ ঘুমোচ্ছে যথারীতি।

একতলায় যে-ঘরটায় সিন্দুকটা ছিল, কাকাবাবু সোজা চলে এলেন সেখানে। সারাদিন দুজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছিল এই ঘরের বাইরে, তারা চলে গেছে সন্ধের পর। এখন ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

একটা আলো জ্বলছে টিমটিম করে।

কাকাবাবু রুদ্রকুমারকে বললেন, এইখানে অত বড় সিন্দুকটা ছিল তো? কাল রাত্তিরে আমি নিজের চোখে দেখে গেছি। আজ সকালে, কারও ঘুম ভাঙার আগেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই যে সিন্দুকটা টেনে নিয়ে যাওয়ার ঘষটানো দাগ। এই দাগটা আসল। দাগটা চলে গেছে ঘরের বাইরে।

কাকাবাবু চলে এলেন ঘরের বাইরে।

মাটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, দাগটা চলে গেছে বাইরের গেটের দিকে। ঘরের ভিতরের দাগ আর বাইরের দাগটা একরকম নয়। ভাল করে দেখুন। পুলিশ ভাল করে নজর করলেই বুঝতে পারত।

ডান দিকে খানিকটা সরে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, এদিকেও একটা ঘষটানির দাগ ছিল, কেউ সেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পুরোপুরি মুছতে পারেনি, এখনও একটু একটু বোঝা যায়। তার মানে, এখান থেকেই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে, সিন্দুকটা গেছে

বাড়ির বাইরে, আসলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ভিতরের দিকে। এটা যে আপনারই কাজ, তার প্রমাণ, আপনি

আমাকে বাইরের নকল দাগটা দেখাতে চাইছিলেন বারবার।

প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট টর্চ বের করে কাকাবাবু সেই অস্পষ্ট দাগটার উপর ফেলে ফেলে এগোতে লাগলেন ডান দিকে।

দাগটা ঢুকে গেছে আর-একখানা ঘরে। সে-ঘরটাও একদম ফাঁকা।

রুদ্রকুমার বলল, তারপর কী হল? এ ঘর থেকে আবার সিন্দুকটা অদৃশ্য হয়ে গেল?

কাকাবাবু বললেন, বারবার অত বড় জিনিসটা অদৃশ্য হবে কেন? এই ঘরে নিয়ে আসার নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে।

কাকাবাবু টর্চের পিছন দিকটা দিয়ে ঘরের দেওয়ালে ঠুকতে লাগলেন। বেশি ঠুকতে হল না, একটা দেওয়ালের প্রায় আধখানা জুড়ে ঠকঠকের বদলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ আওয়াজ হতে লাগল। অর্থাৎ সেটা ফাঁপা।

কাকাবাবু রুদ্রকুমারের দিকে ফিরে হাসিমুখে বললেন, এইখানে আছে সুড়ঙ্গের রাস্তা। সে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে ভাঙা দুর্গটার কাছে। ওদিকের মুখটার নাম বাঘের ফাণ, তাই না? এ দেওয়ালটা কি আপনি সরাবেন, না আমাকেই সরাতে হবে?

রুদ্রকুমার খুবই অবাক হয়ে চেয়ে আছে, কোনও উত্তর দিল না।

কাকার দেওয়ালটার দুদিকে কিছুটা ঠেলাঠেলি করতেই সেটা হঠাৎ স্লাইডিং দরজার মতন একপাশে সরে গেল। এ দেওয়ালটা আসলে কাঠের, বাইরের দিকে প্লাস্টার করা।

ওপাশে বেশ চওড়া সুড়ঙ্গ, অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট আলো।

ভিতরে পা দিয়ে কাকাবাবু বললেন, আসুন, ছোট রাজকুমার। আপনার বাড়িতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবার দেখা যাক, সিন্দুকটা খুলে কী কী পাওয়া গেছে!

রুদ্রকুমারও সুড়ঙ্গের মধ্যে এসে বলল, সত্যি, আপনার যে এতখানি ক্ষমতা, আমার ধারণা ছিল না। সত্যি আশ্চর্য! আপনি ছাড়া এখানকার পুলিশ টুলিস কারও সাধ্য ছিল না এ ব্যাপারটা বোঝার।

সামনের দিকে এগোতে এগোতে কাকাবাবু বললেন, আপনার দাদা অত্যন্ত সৎ লোক, তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, সিন্দুকটার মধ্যে যদি ধনরত্ন, সোনাদানা কিছু থাকে, তা কেউ নিতে পারবে না, সব জমা দেওয়া হবে গভর্নমেন্টের কাছে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু আপনার লোভ হয়েছিল। আপনি ওসব ছাড়তে রাজি নন। তাই এই প্ল্যানটা করলেন। সিন্দুকটা রাখা হল আপনাদের বাড়িতে। সেটা খোলার আগেই চুরি হয়ে গেল। ডাকাতরা নিয়ে গেল ট্রাকে চাপিয়ে। ব্যস, আপনার উপরে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

রুদ্রকুমার বলল, দেখুন, দাদা যেমন অসুস্থ, কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন। তখন এই বাড়ির মালিক হব আমি। এই ভাঙা বাড়ি ছাড়া আমাদের

আর কিছুই নেই। আমি কলকাতায় থাকতে চাই না। এই বাড়ি সারাতে অনেক অনেক টাকা লাগবে। সে টাকা পাব কোথায়? হঠাৎ যদি একটা গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়, সেটা কেউ ছাড়ে? আমি দাদার মতন অমন ধার্মিক নই।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, সিন্দুক খুলে কী পেলেন?

রুদ্রকুমার বলল, সেটা এখনও কোলা যায়নি!

কাকাবাবু বললেন, আঁ! এখনও খোলা যায়নি? দুটো তালা ভাঙা গেল না?

রুদ্রকুমার বলল, তালা ভাঙা গেছে, তবু খুলছে না। মনে হচ্ছে মন্ত্র দিয়ে আটকানো। আপনার তো এত বুদ্ধি, দেখুন না, আপনি যদি খুলে দিতে পারেন, তা হলে ভিতরের জিনিসের ওয়ান ফোর্থ আপনার হবে।

কাকাবাবু বললেন, বললাম না, আমি অন্যের জিনিস কখনও নিই না। আর সিন্দুক টিক খোলার ক্ষমতাও আমার নেই। তবু একবার দেখি গিয়ে।

সুড়ঙ্গটা এখন বেশ চওড়া তো বটেই, এক এক জায়গায়, দুদিকে আরও বেড়ে গিয়ে ঘরের মতন হয়ে গেছে। এখানে কোনও মানুষ বা অনেকে মিলে কয়েকদিন থাকতেও পারে।

সেরকমই একটা চওড়া জায়গায় দুটো হ্যাজাক বাতি জ্বলছে। সিন্দুকটা রয়েছে মাঝখানে। সেটাকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন মানুষ। একটু দূর থেকে তাদের ছায়ামূর্তির মতন দেখাচ্ছিল, কাছে এসে তাদের এক-এক জনকে চিনতে পেরে কাকাবাবু চমকে চমকে উঠতে লাগলেন।

প্রথমেই একজন হাত তুলে বলল, নমস্কার, নমস্কার রায়চৌধুরীবাবু। ভাল আছেন তো?

এ লোকটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল বাদামপাহাড় স্টেশনে। যেচে এসে কথা বলেছিল। যাকে দেখে জোজোর মনে হয়েছিল, জ্যোতিষী।

আর-একজন বলল, চিনতে পারছেন তো স্যার। আমি আব্দুল লতিফ। ভূতের সুড়ঙ্গের কাছে মোম বিক্রি করি।

আর-একজন সেই ট্রেনের কামরার চোখ-বোজা সাধু। এখন অবশ্য দিব্যি চোখ-খোলা। সে একটা হাতুড়ি দিয়ে সিন্দুকটা পিটছে। সেও নমস্কার করল।

একটি মেয়েও রয়েছে সেখানে, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স, তার হাতে একটা ছুরি। কাকাবাবুর মনে হল, একেও খুব সম্ভবত তিনি দেখেছেন আজ দুপুরে মন্দিরের কাছে।

রুদ্রকুমার বলল, এদের ডাকাতের দল বলে ভাববেন না। আমিই একমাত্র ডাকাত। এরা থিয়েটার পার্টির লোক। আমাকে সাহায্য করছে। দেখুন না, সিন্দুকটা এখনও খোলা যায়নি। তালা দুটো ভাঙা হয়েছে, কিন্তু অনেক বছর জলের তলায় থেকে ডালাটা এমন জ্যাম হয়ে গেছে যে খুলছে না কিছুতেই। কাকাবাবু বললেন, ছুরি দিয়ে চাড় দিয়ে দেখা হয়েছে?

আব্দুল বলল, সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে। মনে হচ্ছে, আগুন দিয়ে গালিয়ে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, অনেক সময় লাথি মারলে কাজ হয়। রুদ্রকুমার ঠিক শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, কী মারলে?

কাকাবাবু বললেন, একবার আমার একটা রেডিয়ো খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিছুতেই সারানো যায় না, মেকানিকও কিছু করতে পারল না। আমি তখন রেগেমেগে রেডিয়োটায় এক লাথি কষালুম। অমনি সেটা চলতে শুরু করল।

রুদ্রকুমার সঙ্গে সঙ্গে লাথি মারল সিন্দুকে। কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, এত বড় লোহার সিন্দুক, একজনের লাথিতে কিছু হবে না। সবাই মিলে মারুন।

এবার সবাই সিন্দুকটা ঘিরে দাঁড়িয়ে দমাদ্দম করে লাথি মারতে লাগল।

চার-পাঁচবারের পর সিন্দুকের ডালাটা সত্যি সত্যি একটু উঁচু হয়ে উঠল।

সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে।

আব্দুল ডালাটা টেনে তোলার চেষ্টা করতে সেটা ভেঙেই গেল একেবারে।

আব্দুল বলল, স্যার, আপনি কি ম্যাজিক জানেন? রুদ্রকুমার বলল, দাড়াও, কেউ ভিতরে হাত দেবে না। আগে আমি দেখব।

সবাই তবু ঝুঁকে পড়ল, কাকাবাবু পঁড়িয়ে রইলেন একটু দূরে।

সিন্দুকটা বেশ বোঝাই করা, উপরটা অয়েল ক্লথ দিয়ে মোড়া।

সেটা সরানোর পর দেখা গেল নীল রঙের অয়েল ক্লথ মোড়া কয়েকটা প্যাকেট দড়ি দিয়ে বাঁধা।

দড়ি ছিঁড়ে একটা প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল, তার মধ্যে রয়েছে ভাঁজ করা সব কাগজ।

রুদ্রকুমার অধৈর্য হয়ে কাগজগুলো না দেখেই একপাশে ফেলে দিয়ে আর-একটা প্যাকেট খুলল।

কাকাবাবু সেই কাগজগুলো তুলে নিলেন।

পরপর সাতখানা প্যাকেট ভরতি শুধু কাগজ। প্রত্যেকটা খুলে খুলে ফেলে দেওয়ার পর রুদ্রকুমার সিন্দুকটার প্রায় তলা থেকে টেনে তুলল একটা মুক্তোর মালা!

খুশির চোটে সে বলে উঠল, হুররে!

সে আর-একটা ওইরকম মালা বের করতেই সবাই প্রায় নাচতে শুরু করে দিল।

এরপর আরও অনেক জিনিস বেরোতে লাগল সেই সিন্দুক থেকে, নানারকম গয়না, হিরে-মুক্তো, একটা সোনার জাঁতি, সোনার দোয়াত-কলম, চুনি-পান্না বসানো কয়েকটা কৌটো, তার মধ্যে মোহর।

কাকাবাবু সেসব কিছুই দেখছেন না, তিনি একটা হ্যাজাকের কাছে গিয়ে এক মনে কাগজগুলো পড়ছেন। সংস্কৃত ভাষায় কালো কালি দিয়ে লেখা, অক্ষরগুলো কিছু কিছু

ঝাপসা হয়ে গেছে। কষ্ট করে পড়তে হচ্ছে, তবু কাকাবাবুর মুখে অন্যরকম আনন্দ ফুটে উঠেছে।

সিন্দুক থেকে সব কিছু বের করবার পর রুদ্রকুমার বলল, রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের একটুখানি সাহায্য করেছেন। আপনাকে একটা উপহার দেওয়া উচিত। আপনি এর থেকে আপনার পছন্দ মতন যে-কোনও একটা মালা তুলে নিন।

কাকাবাবু তার দিকে এক দৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বললেন, এর কোনও কিছু নেওয়ার অধিকার আমার নেই। আপনাদেরও নেই। এসব কার সম্পত্তি তা স্পষ্টভাবে এইসব কাগজে লেখা আছে।

রুদ্রকুমার ভুরু নাচিয়ে বলল, তাই নাকি? কার সম্পত্তি?

কাকাবাবু বললেন, ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের।

রুদ্রকুমার বলল, সে আবার কে?

কাকাবাবু বললেন, আপনার বোধহয় ভাল করে ইতিহাস পড়া নেই। পলাশির যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছিল। তাদের একজন প্রধান নেতা ছিলেন এই কানপুরের ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। ইংরেজদের অস্ত্রশক্তি বেশি ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত তারাই জিতে যায়। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়েন। কিন্তু নানাসাহেব কিছুতেই ধরা দেননি। তিনি কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেলেন, তা এ-পর্যন্ত কেউ জানত না। এখন জানা গেল। তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই রাজ্যে।

রুদ্রকুমার মুখ বিকৃত করে বলল, ধুর, ওসব বাজে ইতিহাস কে শুনতে চায়? এবার তা হলে...

চোখ-বোজা সাধুটি বলল, রাজকুমার একটু দাড়ান না। বাকি গল্পটা শুনে তো নিই। তারপর কী হল?

কাকাবাবু বললেন, ওঁদের থাকার জন্য একটা বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত পুকুরটার ধারে যে বাড়িটাকে এখন বলে ভূতের বাড়ি, সেখানে। সে বাড়িতে ওঁরা ছিলেন প্রায় দেড় মাস। সেসব কথা লেখা আছে। তারপর কিছু একটা হয়। নানাসাহেবের কাছে অনেক ধনরত্ন আছে, এরকম অনেকেই ধারণা করেছিল। একরাতে ডাকাতের দল সেই বাড়ি আক্রমণ করে, ডাকাত না হয়ে এখানকার রাজার সৈন্যরাও হতে পারে। নানাসাহেবের অতি বিশ্বাসী সঙ্গীরা প্রাণপণ লড়াই করে সেই আক্রমণকারীদের রুখে দেয়, তাদের মধ্যে সাতজনই মারা যায়। অবশ্য, সেই অবসরে বাকি তিনজনের সঙ্গে নানাসাহেব পিছন দিক দিয়ে পালিয়ে যান। এত বড় ভারী সিন্দুকটা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব নয় বলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলেন পুকুরের জলে। হয়তো ভেবেছিলেন, কোনও এক সময় আরও দলবল নিয়ে ফিরে এসে সিন্দুকটা উদ্ধার করবেন। তা আর আসতে পারেননি।

রুদ্রকুমার বলল, এসব তো কবেকার কথা। এখন তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে চায়। এই কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি এখন আমার।

কাকাবাবু বললেন, ওগুলোর দাম কয়েক কোটি টাকা নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি। ঐতিহাসিক জিনিস হিসেবে ওগুলো অমূল্য। ওই সবই মিউজিয়ামে থাকবে।

রুদ্রকুমার হা হা করে হেসে উঠে বলল, মিউজিয়ামে থাকবে? লোকটা বলে কী? মাথা খারাপ নাকি? এই সম্পত্তি পেয়ে আমি ছেড়ে দেব? এসব বিক্রি করে সেই টাকায় আমি এখানকার রাজা হব।

আব্দুল বলল, আমাদের থিয়েটার পার্টিটা, ভালভাবে গড়া যাবে।

মেয়েটি বলল, কিন্তু কুমারসাহেব, এ-লোকটি বাইরে গিয়ে যদি পুলিশকে সব কিছু বলে দেয়? আজ সন্ধেবেলা ভুবনেশ্বর থেকে একজন পুলিশের বড়কর্তা এসেছেন শুনেছি।

রুদ্রকুমার বলল, সে-কথা কি আর আমি ভাবিনি? ওকে বাইরে যেতে দিচ্ছে কে? ওকে মেরে এইখানে পুঁতে রাখলে কেউ কিছুই টের পাবে না।

লম্বা লোকটি বলল, পুলিশ কিন্তু এই সুড়ঙ্গের মধ্যেও খোঁজ করতে পারে। এখানে কোনও প্রমাণ রাখা ঠিক হবে না। অন্য কিছু ভেবে দেখতে হবে।

রুদ্রকুমার চেঁচিয়ে ডাকল, গুরুপদ! এই গুরুপদ! ব্যাটা এখনও ঘুমোচ্ছে। নাকি?

একটু দূরে সত্যিই মাটিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল একজন লোক। ডাক শুনে সে চোখ মুছতে মুছতে উঠে এল।

রুদ্রকুমার তাকে জিজ্ঞেস করল, এই বুড়োর সঙ্গে যে ছেলে দুটো এসেছিল, তাদের বেঁধে রেখেছিস তো?

লোকটি নাক দিয়ে ঘেতমতন শব্দ করল।

লম্বা লোকটি বলল, হ্যাঁ, জালে বাঁধা আছে। সাধুচরণ ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গর্তের মুখটা ঠিক মতন বন্ধ করে যায়নি, তাই ছেলে দুটো বাঘের ফঁদে নেমে ঠিক কঁকটা দেখে ঢুকে পড়েছিল।

সাধু সাজা লোকটি বলল, তখন যে বড় হাতুড়ি আনতে গেলাম। তাড়াহুড়োতে খেয়াল করিনি।

রুদ্রকুমার বলল, গুরুপদ, এই খোঁড়া লোকটাকে বেঁধে ফেল।

কাকাবাবু বললেন, এই সেই গুরুপদ। আমাদের ড্রাইভার। গাড়িতে অ্যাকসিডেন্ট করিয়ে এ আমাদের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে পালিয়ে ছিল। আমাদের অনেক বিপদ হতে পারত। একে সেজন্য শাস্তি পেতে হবে।

রুদ্রকুমার আবার অট্টহাস্য করে বলল, কে শাস্তি দেবে? তুমি? তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, রায়চৌধুরী!

গুরুপদ কাকাবাবুকে ধরার জন্য দুহাত বাড়াতেই তিনি প্রচণ্ড এক ঘুসি কষালেন তার মুখে।

সে ছিটকে পড়ে গেল দেওয়ালের কাছে। রুদ্রকুমার বলল, হু, তোমার হাতে বেশ জোর আছে দেখছি! ওকে মারলে কী হবে, আমিই তো ওকে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের জঙ্গলে ফেলে আসতে। আমাকে মারো দেখি। আমি এ জেলার বক্সিং চ্যাম্পিয়ন।

সে এগিয়ে এসে কাকাবাবুর মুখ লক্ষ করে ঘুসি চালাল দুবার। কাকাবাবু দুবারই ঠিক সময় মাথা সরিয়ে নিলেন, তার লাগল না। তারপর নিজে

আচমকা একটা ঘুসি কষালেন রুদ্রকুমারের পেটে।

সে দুহাতে পেট চেপে বসে পড়ল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে আবার উঠে দেওয়ালে ঝোলানো একটা তলোয়ারের খাপ খুলে বলল, এবার?

কাকাবাবু বললেন, দেওয়ালে আর-একটা তলোয়ার আছে দেখছি। ওটা আমাকে দাও। তারপর দ্যাখো, তুমি কতক্ষণ আমার সামনে দাড়াতে পারো। তোমার ওই মুঠো করে ধরা দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি তলোয়ার চালানো ভাল করে শেখোনি।

রুদ্রকুমার ভেংচি কেটে বলল, আর-একটা তলোয়ার তোমাকে দেব? এ কি খেলা হচ্ছে নাকি! তুমি এক্ষুনি খতম হয়ে যাবে। তা বুঝতে পারছ না?

কাকাবাবু বললেন, তুমি একটা কাপুরুষ। রাজবংশের লোক হলে কী হবে, তুমি এটা জানো না যে, তলোয়ার হাতে নিলে অন্য পক্ষকে লড়াইয়ের সুযোগ দিতে হয়। ঠিক আছে, মারো দেখি, আমাকে কীভাবে মারবে?

কাকাবাবু ডান হাত দিয়ে একটা ক্রাচ উঁচু করে তুলে ধরলেন।

রুদ্রকুমার এলোপাতাড়ি তলোয়ার চালাতে চালাতে এগোনোর চেষ্টা করল। কয়েকবার আটকে আটকে একবার কাকাবাবু এমন জোরে তার হাতে ক্রাচ দিয়ে মারলেন যে, তলোয়ারটা ছিটকে গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

কাকাবাবু বললেন, কিছুই শেখোনি।

লম্বা লোকটি দেওয়াল থেকে খুলে নিল অন্য তলোয়ারটা। আব্দুল মাটি থেকে কুড়িয়ে নিল আগেরটা। সেটা এনে দিল রুদ্রকুমারকে।

কাকাবাবু বললেন, এবার দুজন। ঠিক আছে।

তিনি ক্রাচ দুটোই মাটিতে ফেলে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তার দুটো হাতই খালি।

রুদ্রকুমার হঠাৎ খুব ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এই, এই, ও এবার পকেটে হাত দেবে। আমার বন্দুকটা কোথায়, বন্দুকটা নিয়ে আয়, শিগগির শিগগির...

কাকাবাবু চোখের নিমেষে পকেট থেকে বের করে ফেলেছেন রিভলভার।

ঠান্ডা গলায় বললেন, না, তোমার বন্দুকটা আর আনা চলবে না। যে যেখানে আছ, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো, কেউ নড়বে না।

লম্বা লোকটি তখনও তলোয়ার উঁচিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, এটা যে খেলনা পিস্তল নয় আর আমার হাতের টিপ কত ভাল, সেটা তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

তিনি একবার গুলি চালালেন, সুড়ঙ্গের মধ্যে তার প্রচণ্ড শব্দ হল।

গুলিটা লেগেছে লম্বা লোকটির ডান হাতের মুঠোয়, তলোয়ারটা ঝনঝন করে পড়ে গেল মাটিতে। লোকটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, তোমরা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলে, সেইজন্য তোমাদের সবাইকে জেলে যেতে হবে। নানাসাহেবের সব জিনিসপত্র যাবে সরকারের কাছে। সবাই একদিকে পাশাপাশি দাড়াও।

কেউ নড়ছে না দেখে কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, আবার গুলি করতে হবে নাকি? সব সরে যাও একদিকে!

এবার সবাই হুড়োহুড়ি করে রুদ্রকুমারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

শুধু ড্রাইভার গুরুপদ তখনও মাটিতে বসে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, ওঠো, ওঠো, যাও ওদিকে। তোমাকে দেখেই আমার রাগ হচ্ছে। দেরি করলে গুলি চালিয়ে দিতে পারি। জঙ্গলে তোমার জন্য আমাদের হাতপা ভাঙতে পারত। তোমার একটা পা খোঁড়া করে দেবার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

গুরুপদ এবার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল ওদের পাশে।

এই দলে যে একটি মাত্র মেয়ে, সে হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল।

কাকাবাবু তাকেও ধমক দিয়ে বললেন, কান্নার কী আছে! তুমিও আমাকে মেরে ফেলার কথা বলেছিলে। যাও, ওদের পাশে যাও!

মেয়েটি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, না, না। আমি ওকথা বলিনি। আমি কোনও দোষ করিনি। আমি কিছুই জানি না!

কাকাবাবু বললেন, ওসব কথা পরে হবে। যাও ওদিকে। তারপর সবাই মিলে লাইন করে ভিতরের দিকে চলো।

মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, না, না, আমি ওদের সঙ্গে যাব না। আমি আপনার কাছে থাকব। আপনি আমাকে বাঁচান।

মেয়েটি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর বুকে। দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

হঠাৎ ওইভাবে মেয়েটি বুকের উপর পড়ায় কাকাবাবু প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। পরেই বুঝলেন, এ-মেয়ের অন্য মতলব আছে। কান্নাটা ওর

অভিনয়।

কিন্তু এক হাতে তিনি ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেন না। মেয়ে বলেই তার গায়ে গুলি চালাতেও পারলেন না কাকাবাবু। শুধু বলতে লাগলেন, সরো, সরো, এ কী করছ!

মেয়েটি এবার খুব জোরে কামড়ে দিল কাকাবাবুর ডান হাত।

কাকাবাবু রিভলভারটা আর ধরে রাখতে পারলেন না। সেটা পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সবাই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে। খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি।

রুদ্রকুমার রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, এবার?

অন্যরা কাকাবাবুকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে চেপে বসেছে তার বুকে। গুরুপদ ঘুসি মারছে তার মুখে। কাকাবাবু চোখ বুজে ফেললেন।

রুদ্রকুমার মেয়েটিকে বলল, তুই দারুণ কাজ করেছিস রে চামেলি। লোকটা সত্যি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। তোকে কিছু পুরস্কার দিতে হবে।

মেয়েটি বলল, আমায় দুছড়া মুক্তোর মালা দিতে হবে।

রুদ্রকুমার বলল, পাবি, পাবি। দুখানা হিরেও দেব।

তারপর সে তার দলের লোকদের বলল, আর মারিস না। এবার ওকে বেঁধে ফেল। গুরুপদ, দড়ি নিয়ে আয়।

গুরুপদ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এল অনেকখানি মোটা দড়ি।

রুদ্রকুমার বলল, ভাল করে বাঁধ। যেন আর কোনও কেরামতি না করতে পারে। শুনেছি, এই রায়চৌধুরী নাকি অনেক জায়গায় অনেকরকম বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। এবারেই ওর খেলা শেষ।

কাকাবাবু জ্ঞান হারাননি। কোনও কথা বলছেন না। তার নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। একটা চোখেও লেগেছে খুব।

রুদ্রকুমার লম্বা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, কী করব? এখানেই খতম করে দেব ওকে?

সে বলল, তা হলে লাশটা ফেলবেন কোথায়! এখানে রাখা যাবে।

রুদ্রকুমার বলল, সেটা ঠিক কথা। এক কাজ করা যাক। ওকে গর্জনতলা নিয়ে যা কয়েকজন মিলে। ওখানে একটা বিরাট খাদ আছে জানিস তো? সেখানে ওকে ঠেলে ফেলে দিবি নীচে। অত উঁচু থেকে পড়লে কোনও মানুষের পক্ষেই বাঁচা সম্ভব নয়। ঠেলে ফেলার আগে ওর দড়ির বাঁধন খুলে দিবি। তা হলে মনে হবে অ্যাকসিডেন্ট। ছেলে দুটোও তো বাঁধা আছে। তাদেরও নিয়ে যা। একইরকমভাবে ফেলে দিবি নীচে। পুলিশ বুঝবে ওরা নিজেরাই কোনওভাবে পড়ে গেছে। আমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। আমার দাদাকে সেই কথা বুঝিয়ে দেব।

লম্বা লোকটি বলল, আপনি যাবেন তো সঙ্গে?

রুদ্রকুমার বলল, না, না, আমি কী করে যাব? এত সব জিনিসপত্র এখানে পড়ে থাকবে? তোরা কয়েকজন মিলে যা। তুই, সাধুচরণ, আরএকজন অন্তত।

আব্দুল লতিফ বলল, আমি এখানেই থাকতে চাই।

রুদ্রকুমার বলল, তা হলে গুরুপদ যাক। তিনজনই যথেষ্ট। এর হাতপায়ের বাঁধন যখন খুলবি, তখন কিন্তু খুব সাবধান। এক কাজ করতে পারিস। একটা লোহার ডান্ডা কিংবা হাতুড়ি নিয়ে যা। বাঁধন খোলার আগেই হাতুড়ি মেরে ওর মাথাটা একেবারে ভেঙে দিবি। খাদের নীচে পড়লে মাথাটা তো এমনিতেই ছাতু হয়ে যাবে। ছেলে দুটোরও ওই একই ব্যবস্থা করিস। বাঁধন খোলার আগেই খতম করে দিলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

লম্বা লোকটি বলল, গর্জনতলা তো অনেকটা দূরে। কী করে যাব?

রুদ্রকুমার বলল, গাড়িতে যাওয়া চলবে না। তা হলে ড্রাইভার সাক্ষী থাকবে। হেঁটেই চলে যা। ভাবিস না, তোদের সবাইকেই আমি ভাল মতন পুরস্কার দেব। আর দেরি করে লাভ নেই! এত রাত্তিরে বাইরে কেউ থাকবে না, তোদের কেউ দেখতেও পাবে না।

দু-তিনজন মিলে কাকাবাবুকে দাড় করিয়ে দিল।

রুদ্রকুমার বলল, গুডবাই, রায়চৌধুরী। কেন আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসেছিলে? তোমার কপালে এইরকম মৃত্যুই লেখা ছিল, বুঝলে তো!

এতক্ষণ বাদে কাকাবাবু বললেন, আমার ক্রাচ দুটো সঙ্গে দাও!

রুদ্রকুমার হেসে বলল, তুমি যেখানে যাচ্ছ, সেখানে আর ক্রাচ লাগবে। এ দুটোর মধ্যে কোনও অস্ত্র লুকোনো আছে কি না কে জানে? পরে ভাল করে পরীক্ষা করে আগুনে পুড়িয়ে দেব। কোনও প্রমাণ রাখব না।

ওরা তিনজন কাকাবাবুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল।

খানিকটা যাওয়ার পর রেলের কামরায় সেই চোখ-বোজা সাধুটি বলল, তোমার ভাইপো না ভাগনে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি সাধু হয়েছি কেন? বাবা-মা-ই আমার নাম রেখেছে সাধুচরণ। আমাদের নাটকে আমাকে সাধুর পার্ট দেওয়া হয়েছে। তাই মাঝে মাঝে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াই। সাধু সাজলে রেলের ভাড়াও লাগে না।

লম্বা লোকটি বলল, আমাদের নাটকে সেই সাধু আবার ছদ্মবেশী এক খুনি।

সাধুরচণ বলল, সে পার্টটাও আমি ভালই করছি। কী বলো?

লম্বা লোকটি বলল, আমার নাম হরকুমার। কাল রেল স্টেশনে তোমাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। সিন্দুকটা নিয়ে মাথা না ঘামালে তোমার এই অবস্থা হত না।

কাকাবাবু এদের সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করলেন না।

সুড়ঙ্গটা ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। তলাটা এবড়োখেবড়ো। ক্রাচ ছাড়া হাঁটতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে কাকাবাবুর। সামনে সামনে যাচ্ছে সাধুচরণ। তার হাতে একটা মশাল। পিছন থেকে দুজন তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঠেলতে ঠেলতে।

এক জায়গায় সাধুচরণ জিজ্ঞেস করল, ছেলে দুটো কোথায় রে? এই গুরুপদ, আর কতটা দূরে?

গুরুপদ বলল, দূর নেই।

কয়েক মিনিট যাওয়ার পর সুড়ঙ্গটা আবার চওড়া হয়ে গেল। প্রায় একটা গোল ঘরের মতন।

এখানে দেওয়ালের গায়ে অনেক গর্ত। ওদের পায়ের শব্দ পেতেই সেইসব গর্ত থেকে কিচকিচ করে উঠল কয়েকটা ইঁদুর।

সাধুচরণ বলল, এখানেই তো থাকার কথা।

হরকুমার বলল, দড়ির জালটা তো এখানেই উপরে বাঁধা থাকে। গেল কোথায়?

মশালটা নিয়ে একটু খুঁজতেই দেখা গেল এক জায়গায় জালটা ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। প্রায় টুকরো টুকরো অবস্থা।

সাধুচরণ দারুণ হতাশভাবে বলল, যাঃ, ছেলে দুটো পালিয়েছে?

হরকুমার বলল, জালটা অনেকদিন ব্যবহার হয়নি। তাও তো বেশ মজবুত ছিল। ছিড়ল কী করে?

সাধুচরণ বলল, কী করে ছিড়ল, সে চিন্তা করে লাভ নেই। ছেলে দুটো পালিয়েছে, এটাই আসল কথা। এখন কী হবে? ছোটবাবুকে জানাতে গেলেই তো দারুণ চটে যাবে।

হরকুমার বলল, একেই তো দারুণ রগচটা। তার উপর হাতে রয়েছে পিস্তল। রেগেমেগে হয়তো গুলিই করে দেবে!

সাধুচরণ বলল, এই ব্যাটা গুরুপদরই তো পাহারা দেওয়ার কথা। শুধু পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল বোধহয়। এখন তুই যা, খবর দে ছোটকুমারকে। জিজ্ঞেস করে আয়, আমরা শুধু একেই নিয়ে যাব কিনা গর্জনতলায়।

গুরুপদ ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে, দুহাত নাড়তে নাড়তে বলতে লাগল, না,, না!

সাধুচরণ বলল, এ যাবে না। আমিও যেতে রাজি নই।

হরকুমার বলল, আমার একা যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে এক কাজ করা যাক। এখন রায়চৌধুরীকে একাই গর্জনতলায় ফেলে আসা যাক। ছেলে দুটো তো সিন্দুকের মধ্যে কী আছে, তা জানে না, কোনওদিন জানতেও পারবে না। ওদের এখন না মারলেও চলবে। ওরা জানবে, ওদের কাকাবাবু অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। চল তা হলে!

ওরা আবার কাকাবাবুকে ঠেলতে শুরু করল।

এরপর সুড়ঙ্গটা আবার খুব সরু হয়ে গেল। মাথা নিচু করে দেওয়াল ধরে ধরে এগোল। এক জায়গায় সাধুচরণ একটা দরজা খুলে ফেলল, তারপরেই বাঘের ফাঁদের সেই গর্ত।

সাধুচরণ হরকুমারকে বলল, আগে তুই উপরে উঠে উঁকি মেরে দ্যাখ, বাইরে কেউ আছে কি না।

হরকুমার খাঁজ দিয়ে উপরে গিয়ে বলল, না, কেউ নেই। সব শুনশান।

সাধুচরণ কাকাবাবুকে বলল, ওঠো। পা বাঁধা অবস্থায় তবু লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা যায়, কিন্তু খাঁজ বেয়ে উঠবেন কী করে কাকাবাবু। হাতও বাঁধা।

গুরুপদ আর সাধুচরণ তাকে ঠেলে তুলল, উপর থেকে হরকুমার তার কঁধ ধরে টেনে নিল।

এখানটা এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ আর নির্জন। আকাশে রয়েছে জ্যোৎস্না, আকাশটা ঠিক যেন পাউডার মাখানো। বড় বড় গাছগুলো পঁড়িয়ে আছে। আলোছায়ার মধ্যে।

হরকুমার বলল, গর্জনতলা অনেকটা দূর। এইরকমভাবে ও লাফিয়ে লাফিয়ে যাবে? অসম্ভব।

সাধুচরণ বলল, পায়ের বাঁধনটা খুলে দিতেই হবে। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাবে। দে, গুরুপদ, পা-টা খুলে দে।

তারপর সে কাকাবাবুকে বলল, খবরদার, তেড়িবেড়ি করতে যেয়ো না। দৌড়োতে তো পারবে না। পালানোর চেষ্টা করলেই এই হাতুড়ির ঘা মারব মাথায়?

হরকুমার বলল, এক কাজ কর না। এখানেই ওর মাথাটা ভেঙে দে। তারপর ওর দেহটা আমরা কাঁধে করে নিয়ে যাব। সেটাই সুবিধে।

সাধুচরণ বলল, কাঁধে করে মড়া নিয়ে যাব? ওসব আমি পারব না। তা ছাড়া, ছোটকুমার যা বলেছে, তাই করতে হবে। চল, চল।

ঠিক তক্ষুনি কাকাবাবু শুনতে পেলেন একটা পাখির ডাক। মনে হল যেন একটা দোয়েল পাখির শিস।

কী সুন্দর সেই সুর। ঠিক যেন অসহ্য গরমের পর এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস। মনটা জুড়িয়ে যায়।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হরকুমার বলল, রাত্তিরবেলা পাখি ডাকছে?

সাধুচরণ বলল, এগো না। এখন পাখির ডাক শুনতে হবে না।

কাকাবাবুর মুখে ছড়িয়ে গেছে হাসি।

তিনিও অবিকল সেই পাখির ডাকের মতন শিস দিতে লাগলেন।

এবারে সাধুচরণের কিছু একটা সন্দেহ হল। সে বলল, কী ব্যাপার, কী ব্যাপার? এ লোকটা শিস দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে। মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব।

সে হাতুড়িটা উঁচু করতেই কাকাবাবু এক পা তুলে তার পেটে মারলেন লাথি। সে মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল।

ভাঙা দুর্গটির ভিতর থেকে একলাফে বেরিয়ে এল সন্তু। হাতে তার একটা লম্বা বন্দুক।

সন্তু চিৎকার করে বলল, সাবধান, গুলি চালাব।

কাকাবাবু বললেন, ওর হাতের টিপ কিন্তু খুব ভাল। সন্তুর পিছন পিছন ছুটে এসেছে জোজো আর কমলিকা।

সন্তু বলল, কাকাবাবুর দড়ির বাঁধন আগে খুলে দে জোজো।

জোজো কাকাবাবুর কাছে এসে বাঁধন খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, ইস, একটা ছুরি থাকলে ভাল হত। যাক গে, অনেক দিন নখ কাটিনি, বড় নখ থাকলে গিট খোলার সুবিধে হয়।

কমলিকা কাছে এসে বলল, কাকাবাবু, আপনার কোথাও লাগেনি তো?

কাকাবাবু বললেন, আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল, এখন একটা চোখ দিয়ে খুব জল পড়ছে। তা বলে ভেবো না যেন আমি কাঁদছি! সন্তু বন্দুকটা পেল কোথায়?

কমলিকা বলল, আমাদের বাড়ির বন্দুক! সন্তু চাইল। আমার দাদা বন্দুক চালানো শেখেনি।

বাঁধন মুক্ত হয়ে কাকাবাবু ওদের তিনজনের সামনে এসে বললেন, তোমরা যারা আমার মুখে ঘুসি মেরেছ, তাদের প্রত্যেককে ওইরকম ঘুসি খেতে হবে। আমার গায়ে কেউ হাত তুললে তাকে আমি ক্ষমা করি না।

রাজবাড়ির দিক থেকে ছুটে এল তিনজন পুলিশ, আগে আগে রয়েছে বিনয়ভূষণ মহাপাত্র।

তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, এখানে কী হয়েছে? স্যার, আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? আমাদের বড়সাহেব এসেছেন, ওদিকের সুড়ঙ্গের মুখটা এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

কাকাবাবু বললেন, এই তিনজনকে বাঁধুন। আমি ওদিকে যাচ্ছি। এখান থেকে আর কেউ বেরোনোর চেষ্টা করলেই ধরবেন!

৯. কিরণচন্দ্র ভঞ্জদের জ্বর

কিরণচন্দ্র ভঞ্জদের জ্বর অনেকটা কমেছে। তবু শরীর খুব দুর্বল। কথা বললেন খুব আস্তে আস্তে। কাকাবাবুদের দেখে ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাড়ানোর চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, উঠবেন না, বসুন, বসুন!

সন্তু আর জোজোও এসেছে কাকাবাবুর সঙ্গে।

কিরণচন্দ্র বললেন, আমার আর এখানে থাকা হবে না। ছেলে বলছে, কলকাতায় গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। আপনারা এখানে যতদিন ইচ্ছে থাকুন। কমলিকা আপনাদের দেখাশুনো করবে।

কাকাবাবু বললেন, না, আমাদেরও আজ চলে যেতে হবে। পুলিশের আই জি অখিল পট্টনায়ক এখানে এসেছেন, তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের চেনা। তিনি আমাদের ভুবনেশ্বর নিয়ে যেতে চান।

কিরণচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছিলেন, তার কিছু হয়েছে?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। নানাসাহেব যে তার দলবল নিয়ে এই রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি।

কিরণচন্দ্র বললেন, ওই সিন্দুকটা বুঝি নানাসাহেবের?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ।

কিরণচন্দ্র বললেন, কলকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা হলে সব শুনব। ছি ছি, কী লজ্জার কথা বলুন তো! আমারই বাড়ি থেকে সিন্দুকটা চুরি হল, আর সেটা চুরি করল আমার নিজের ভাই? ছি ছি ছি। ওকে পুলিশে ধরেছে, বেশ করেছে! ওর শাস্তি পাওয়াই উচিত। অল্প বয়েস থেকেই ও খুব লোভী আর হিংসুটে।

ভাঙা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বললেন, অন্যের টাকাপয়সা দিয়ে এ-বাড়ি সারালেও কি আর আমাদের পুরনো কালের গৌরব ফিরবে? না, না, আর ফিরবে না। রাজবংশের দিন চলে গেছে!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়িতেও যে একটা সুড়ঙ্গ আছে, তা আপনি জানতেন?

কিরণচন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, জানতাম বটে। কিন্তু আমার বাবা বেঁচে থাকতেই দুদিকের মুখ একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গত তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ ওটা ব্যবহার করেনি। আমার এই ভাইটা, রুদ্র, ও আবার মুখ দুটো খুলে ফেলেছে নিশ্চয়ই। আমায় কখনও কিছু জানায়নি। রায়চৌধুরীদা, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব, আপনি আমাদের পরিবারের সম্মান বাঁচালেন। নানাসাহেবের সব জিনিস ঠিকঠাক পুলিশের কাছে জমা পড়েছে তো? রুদ্র কিছু সরাতে পারেনি?

কাকাবাবু বললেন, না। সবই জমা পড়েছে। শুধু পট্টনায়কের অনুমতি নিয়ে আমি একটা পান্নার মালা তুলে নিয়েছি। সেটা রাজকুমারী কমলিকার জন্য।

কিরণচন্দ্র কিছু বলতে যেতেই কাকাবাবু বললেন, না, না এ-নিয়ে আপনি কিছু আপত্তি করবেন না। এইটুকু একটা উপহার আমি দিতেই পারি!

আর একটুক্ষণ কথা বলে কাকাবাবুরা চলে এলেন সেখান থেকে। খাবার ঘরে কমলিকা ওদের জন্য অপেক্ষা করছে প্লেট সাজিয়ে। ওদের দেখেই বলল, লুচি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে যে! সন্তু আর জোজো, তোমরা কী দিয়ে লুচি খাবে?

সন্তু বলল, বেগুনভাজা।

জোজো বলল, ক্ষীর।

কমলিকা বলল, ঠিক আছে, দুটোই পাবে!

জোজো বলল, আমি যদি আতার পায়েস চাইতুম, তা দিতে পারতে?

কমলিকা বলল, তা হলে একজন ম্যাজিশিয়ানকে ডেকে আনতে হত।

জোজো বলল, ডাকতে হবে কেন? আমিই তো ম্যাজিক জানি। দেখবে, দেখবে, তুমি যদি এখন একটা পান্নার মালা চাও, আমি এক্ষুনি কাকাবাবুর পকেট থেকে একটা লাল পাথরের মালা বের করে দেব।

সন্তু বলল, পারবি? আমি চ্যালেঞ্জ করছি, তুই কিছুতেই পারবি না!

জোজো বলল, পারব না মানে? দ্যাখ, আগে একটা মন্ত্র পড়ে নিই!

সন্তু বলল, যতই মন্ত্র পড়িস, পান্নার মালা কিছুতেই লাল হবে না। আসলে পান্না হচ্ছে সবুজ!

কাকাবাবু হাসতে হাসতে সবুজ মালাটা বের করে কমলিকার গলায় পরিয়ে দিলেন।

কমলিকা লজ্জা পেয়ে বল, না, না আমি এটা নেব না। অন্যের জিনিস নিলে আমার বাবা রাগ করবেন।

কাকাবাবু বললেন, না, রাগ করবেন না। তোমার বাবাকে আমি বলে নিয়েছি।

খাওয়া শুরু করার পর কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, তোরা সুড়ঙ্গটায় ঢোকার পর একটা জালে আটকা পড়েছিলি শুনেছি। সেখান থেকে উদ্ধার পেলি কী করে?

জোজো বলল, আমাদের আটকে রাখতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও জাল তৈরি হয়নি!

সন্তু বলল, তা ঠিক। কিন্তু তুই ভয়ে কেঁদে ফেলেছিলি!

জোজো বলল, সে তো জালের জন্য নয়। ইঁদুরের জন্য। ওরে বাপ রে, অত বড় বড় ধেড়ে ইঁদুর আমি সাতজন্মে দেখিনি!

সন্তু বলল, সত্যি কথা বলতে কী, আমিও একটু ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু ইঁদুরগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমরা জালে আটকা পড়েছি, একগাদা ইঁদুর ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপর। আমরা হাত-পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে ইঁদুরগুলো সরাবার চেষ্টা করছি, ওরা যায় না। জাল কামড়ে ঝুলতে লাগল। ওদের দাঁতের ধারে জালের দড়ি কেটে যেতে লাগল এক এক জায়গায়। তাতেই অনেকটা ফাঁক হতেই আমি বেরিয়ে পড়লাম আগে, তারপর টেনে বের করলাম জোজোকে। ইঁদুরগুলোকে লাথি মারতে মারতে লাগালাম দৌড়। শেষ গর্তটায় এসে বন্ধ করে দিলাম দরজাটা। ব্যস! তারপরেই মুক্তি!

জোজো বলল, আমার পায়ে দুজায়গায় ইঁদুর কামড়েছে। যদি সেপটিক হয়, তাই দৌড়ে চলে এলাম কমলিকার কাছে ডেটল চাইতে।

সন্তু বলল, একটু পরেই দুগাড়ি ভরতি পুলিশ এসে পড়ল। তাদের মধ্যে রয়েছেন আই জি অখিল পট্টনায়ক। ওঁকে আমাদের বাড়িতে কয়েকবার দেখেছি, উনিও আমায় দেখে চিনতে পারলেন। উনি এসেছেন সিন্দুকটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে। কাকাবাবু, তোমাকে কোথাও দেখা গেল না। তবে, নটবর সিংহ বলল, রুদ্রকুমারের সঙ্গে তুমি বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ, আর বেরোওনি। অথচ বাড়ির মধ্যে কোথাও দুজনকে পাওয়া গেল না। অখিল পট্টনায়ক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার মনে হল, নিশ্চয়ই তা হলে এই বাড়ির মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢোকার কোনও রাস্তা আছে। কিন্তু ঢোকার জায়গাটা কোথায়, তা বোঝা যাচ্ছিল না কিছুতেই।

জোজো বলল, আমিই তো তখন বললাম সন্তুকে, পুলিশ এ দিকটা খুঁজুক। ততক্ষণ আমরা অন্য দিকটায় গিয়ে দেখি, ওখান থেকে কেউ বেরোচ্ছে কি না!

সন্তু বলল, হ্যাঁ, জোজোই ঠিক বলেছিল। কমলিকাদের বন্দুকটা নিয়ে আমরা ওদিকে দৌড়ে গেলাম। গর্তটার মধ্যেও নামতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ ভিতরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে লুকিয়ে রইলাম ভাঙা দুর্গটায়। দেখতে চাইছিলাম, ওদের হাতে বেশি অস্ত্রশস্ত্র আছে কি না!

জোজো বলল, সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানেন, কাকাবাবু। সন্তুর হাতে বন্দুকটা ছিল কিন্তু একটাও গুলি ছিল না।

কমলিকা তাড়াহুড়োতে গুলি খুঁজে পায়নি।

কমলিকা বলল, গুলি নেই, তা খুঁজে পাব কী করে?

সবাই হেসে উঠল একসঙ্গে।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, তা হলে নানাসাহেব যে এখানে ছিলেন, তার সব প্রমাণ তুমি পেয়ে গেলে?

কাকাবাবু বললেন, সবটা পাওয়া যায়নি। নানাসাহেব যে এখানে ছিলেন, কিছুদিন থেকেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারপর, আমার যতদূর মনে হয়, ডাকাতদের আক্রমণে ওঁর দলের কয়েকজন মারা যায়। বোধহয় তাদেরই মাথার খুলি পাওয়া গেছে পুকুরে। নানাসাহেব বাকি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পালানোর সময় সিন্দুকটা পুকুরে ফেলে যেতে বাধ্য হন।

সন্তু বলল, তারপর উনি কোথায় যেতে পারেন?

কাকাবাবু বললেন, এবার সেটাই খুঁজে বের করতে হবে। সেটাই আমার পরবর্তী কাজ হবে। চলো, আপাতত আমাদের ভুবনেশ্বর যেতে হবে। ওঠা যাক।

জোজো বলল, কাকাবাবু, তার আগে একবার গর্জনতলা নামের জায়গাটা দেখে গেলে হয় না? যেখানে আমাদের তিনজনকে মেরে ফেলার কথা ছিল।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক বলেছ, সেই খাদের জায়গাটা একবার দেখে আসা যাক।

কমলিকা, তুমি জায়গাটা দেখেছ?

কমলিকা বলল, না, নাম শুনেছি। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

একটু বাদে সবাই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

ওঁরা যখন গর্জনতালয় পৌঁছোলেন, তখন বেশ রাত হয়েছে, আকাশ ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়।

এই খাদের নীচে পড়ে গেলে সত্যিই বাঁচার কোনও আশা নেই। কিন্তু এখন উঁকি মেরে দেখলে জায়গাটা মোটেই ভয়াবহ মনে হয় না। চতুর্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর নিবিড় বন।

কী যেন একটা রাত পাখি ডাকছে।

জোজো বলল, ওই রুদ্রকুমারকেই এখান থেকে ঠেলে ফেলা উচিত ছিল। সেটাই হত ওর ঠিক শাস্তি।

কাকাবাবু বললেন, ওসব চিন্তা আর কোরো না। এখন এ জায়গাটা এত সুন্দর লাগছে, এখন খারাপ কথা ভাবতে নেই। খানিকটা রেলিং দিয়ে ঘিরে দিলে এ জায়গাটা চমৎকার পিকনিক স্পট হতে পারে। তোমরা কেউ একজন

একটা গান গাও।

জোজো বলল, আমি গাইব?

সন্তু বলল, না, না, তুই চুপ কর।

কমলিকা গাইবে।

কমলিকা বলল, আমি তো গান জানি না।

সন্তু বলল, অ্যাই, আমাদের বাঘের ফঁদে ফেলার আগে তুমি যে বলেছিলে দুটো গান শোনাবে?

কমলিকা মুচকি হেসে বলল, সে তো মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

কাকাবাবু বললেন, মিথ্যে কথা বলেছিলে। খুব খারাপ! তুমি যে সন্তু আর জোজোকে বাঘের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিলে, ওরা কিন্তু তার কোনও শোধ নেয়নি। এখন যদি গান না গাও, তা হলে ওরা কিন্তু শোধ নিতে পারে।

কমলিকা দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর গেয়ে উঠল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...